কাঠ-খড়-কেরোসিন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন—১৩৫২

প্রকাশক—
শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—
সত্যপ্রসন্ন দত্ত,
পূর্ব্বাশা লিমিটেড,
পি-১৩ গণেশ চন্দ্র এভেন্যু,
কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম এক টাকা বারো আনা

সূচীপত্র

এই গল্পগুলির রচনাকাল—১৩৫১-৫২

কাই

খালি গাছ আর জঙ্গল। নদীতে চর জাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই গাছ গজায়—ছইলা আর আরগুজি, কেওড়া আর লোনা-ঝাউ। দেখতে-দেখতে লতার দল লেলিয়ে ওঠে, কুটুম-পাগলি যে লতা সে বাঘকে পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে। বালির চর দেখতে-দেখতে কালিজঙ্গলে ভরে যায়।

হ্যাঁ, জঙ্গল হাসিল কর। বন-বাদায় আবাদ বসাও। গোলা-গঞ্জ হাট-বাজার বাগান-বাগিচা পত্তন কর।

জঙ্গল উঠিত না হয়, ঝড় আসুক একটা। নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে সেই অগ্নিমুখ থেকে সর্বনাশা ঝড় আসুক একটা—সব গাছগাছড়া ভূমিসাৎ হয়ে যাক।

তাই যাবে এক দিন। কয়লার খাদ যখন শূন্য হয়ে যাবে তখন মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মত গাছ কাটবে। তার একদিকে চাই শস্য, অন্য দিকে চাই আগুন।

চালানি নৌকোয় কাঠ এসেছে নদীর ঘাটে। মঙ্গল চাপরাশি নদীর ধাপায় ঝাঁপিয়ে পড়ল : 'কি কাঠ ?'

কে একজন বললে, 'সুপারির চেলা।'

কিছু কাল আগে এ অঞ্চলে রাঙা মেঘের এক লাল ঝড় এসেছিল। তাতে কয়েক শো মাইল একেবারে ফর্সা হয়ে গিয়েছিল, গাছের বংশ ছিল না। সাদা ও সিধে সাদাসিধে যত সুপারি গাছ ছিল, সব নির্মূল হয়ে গেছে। আর-সব কাঠ শেষ হয়ে গেলেও সুপারির চেলা আসছে নৌকো-বোঝাই হয়ে।

ঝড়টা এসেছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। বানবন্যায় গরু-মানুষ অনেক ভেসে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গাছও ভেঙে পড়েছিল অগণ্য। গাছ না পড়লে মানুষ জ্বালতি পেত কোথায় ? রান্না করত কি করে ?

কয়লা নেই।

সুশীল ধমক দিয়ে উঠল। ধমক দেবার কারণ আছে। কণ্ট্রোলে
হেনস্তা সে সইতে পারে না। সে হচ্ছে এখানকার সিভিল সাপ্লাই
নতুন ইনস্পেকটর। নামের শেষে আগে আই-সি-এস লিখত
উপরালার হুকুমে এখন আই-ও-সি-এস লিখছে, ইনস্পেকটর অ
সিভিল সাপ্লাইজ।

চাল কণ্ট্রোল হয়েছে বটে, কিন্তু চুলো এখনো বশে আনা যায়নি।

'আমার চাপরাশিটা বাড়ি গেছে। সে ফিরে এলে দাম ঠিক ক
দেব।'

মাঝিরা নড়তে চায় না। বলে, 'আমাদের আসতে আবার সে
হাটবার।'

সুশীলও নেইআঁকড়া। 'সেই হাটবারেই তবে নিয়ে যেয়ো।'

ফিরতি হাটবারেই আবার মাঝিরা এসে হাজির।

গা গুলিয়ে উঠল সুশীলের। খেয়াল ছিল না আজই মঙ্গলকে এ
সপ্তাহের অনুগ্রহবিদায় দিয়ে দিয়েছে। বউয়ের অসুখ, বাড়ি-মেরামত
অনেক রকম কাঁদুনি। এখন নিরুপায় রাগে জ্বলতে লাগল সুশীল
বললে, 'সে-ষ্টুপিডটা তো ছুটি নিয়ে গেছে। আর ক ঘণ্টা আগে এলেন
কেন?'

'নিকট-পথ তো নয়, হুজুর, লোকলস্করও বেশি নেই—' মাঝিরা বলে
মিনতি করে।

'দামটা এখনো বোঝাপড়া হয়নি চাপরাশির সঙ্গে—'

'এর আবার বোঝাপড়া কি! ন্যাজ্য দামই তো দেবেন।'

একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। সুশীল তিন টাক
বার করে দিল। বললে, 'বাকি দাম মঙ্গল এলে পা চুকিয়ে দেব।'

কেঁচা-মারা পাঁকের মাছের মত গুটিয়ে গেল মাঝিরা। অবিচারা

এত প্রত্যক্ষ যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। শেষে ক্ষীণস্বরে বললে, 'সে কবে আসে তার ঠিক কি।'

'এক হপ্তা মোটে ছুটি। ছুটির শেষেই মাস কাবার। না এসে যাবে কোথায় ?'

তবু কালো চিটে-পড়া নোট তিনটে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না মাঝিরা। বলে, 'বড় আতান্তরে আছি, হুজুর, দিনান্তর খাওয়া হয় না—'

কিন্তু সুশীল কাঠ। বললে, 'হবে, হবে, মঙ্গল ফিরে আসুক।'

তবু আরো কতক্ষণ বসে রইল মাঝিরা। শেষে নিরুপায়ের মত চলে গেল।

কারা যেন আস্তব্যস্ত হয়ে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে।

'শুনুন।'

ভিতর থেকে সুশীল বললে. 'কে ?'

খুব ভারি গলায় উত্তর এল : 'বাইরে আসুন।'

বাইরে এসে দেখে—তিনজন যুবক ভদ্রলোক। একজন পাজামা, দ্বিতীয়জন লুঙ্গি, তৃতীয় মালকোঁচা।

'আমরা এখানকার কমিউনিষ্ট—'

সম্ভ্রমে চেয়ার এগিয়ে দিতে লাগল সুশীল।

'না, বসতে আসিনি। বসে থাকবার সময় কই আমাদের!' বলে রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল : 'আপনি কাঠ কিনে কাঠের দাম দিচ্ছেন না, তার মানে কি ?'

সুশীল লক্ষ্য করে চেয়ে দেখল সেই দুটো কাঠওয়ালা মাঝি। বুঝল আদালতে না গিয়ে পঞ্চায়েতিতে গেছে।

রাগে শরীর রি-রি করে উঠল। দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে রাগটা

থামাতে পারলেও ঝাঁজ কমাতে পারল না। 'দাম দিচ্ছি না মানে

'হ্যাঁ, জানি, তিন টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তিন টাকা দাম না

দাম সাতাশ টাকা।'

'কোন হিসেবে ?'

'সোজা হিসেবে। ওদের থেকে আপনি ন আঁটি কাঠ নিয়েছে

তিন টাকা করে আঁটি—তিন-নয় সাতাশ, নামতা না পড়েও জানা যায়

সুশীল একবার তাকাল মাঝিদের দিকে। মাঝিদের চোখে এ

রাগ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা।

'নয় আঁটি নিয়েছি ? ভাল করে খোঁজ করেছেন ?'

'খোঁজ নেবার দরকার হয় না। এরা মাটির কাছাকাছি মা

এরা সত্য ছাড়া মিথ্যে বলে না—'

'আর যদি বেশি কিছু নেয়ই আদায় করে, দোষ দিতে পারেন কি

বড় শান্ত গলায় বললে লুঙ্গিধারী। 'এতদিন অনেক শুষেছি ও

এবার আদায়ের পৃষ্ঠে মুশমা দেবার সময় এসেছে।'

'তাই বলে তিন টাকা করে সুপারির চেলা ?'

'সুপারির চেলা নয় তো কি আপনাকে শাল-সেগুন লোহা-সু

দেবে ?' মালকোঁচা প্রায় মুখিয়ে এল।

সুশীল বসল চেয়ারে। সিগারেট ধরাল। বললে, 'সব ছেড়ে এ

বুঝি কাঠে এসেছেন ?'

'শুধু কাঠে কেন, হাটে-মাঠে-ঘাটে, সর্বঘটেই আছি। যেখ

যত কিছু শোষণ ও পেষণ সেখানেই আমরা এগিয়ে আসি—'

'ঝাঁপিয়ে পড়ি।' বললে মালকোঁচা।

'শেষ পর্যন্ত শোষণটা বুঝি আমার এখানেই আবিষ্কার করলেন ? f

আমি যদি সিভিল সাপ্লাইর না হয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টর হতাম, এগো

সাহস করতেন? কিংবা আমার চাকরির আদ্যাক্ষরের 'ও'-টি যদি না থাকত, তা হলে?'

'বাজে কথা বলবার সময় নেই আমাদের। দিয়ে দিন টাকাটা।'

'আপনারা আদালতের পেয়াদা নন, ক্রোক বা দখল-উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে আসেন নি। সুতরাং আপনাদের আদেশ বা অনুরোধ কোনোটা শুনতেই আমি বাধ্য নই।' সুশীল গম্ভীর হল।

'দেবেন না?'

'আমার চাপরাশি কাঠ এনেছে, সে ফিরে আসুক, বাকি দাম তখন দিয়ে দেব। কি দর, কটা বা বোঝা সব সে জানে।'

'আর আমরা জানি না?' মাঝিরা ঝাঁজিয়ে উঠল।

সুশীল আর কথা বলল না। আর তার এই স্তব্ধতাটাই মনে হল প্রবল গলাধাক্কার মত।

মাঝিরা অনেক আশ্বাস পেয়ে এসেছিল, আর সেই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে খাঁইটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল স্বচ্ছন্দে। এখন পারে এসে ভরাডুবি হয় দেখে বিগলিত গলায় বললে, 'কমিয়ে-টমিয়ে রফানিষ্পত্তি করে যা হয়, হুজুর—বড্ড গরিব—'

কর্মীরা ধমকে উঠল। হেঁচকা টান মারল হাত ধরে। বললে, 'অধিকারের কাণাকড়িও ছাড়বিনে। এখন কেস আমাদের হাতে। চলে আয়—'

পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে প্রায় মার্চ করে চলে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে সুশীল দেখল কতগুলি স্কুলের ছেলে-মেয়ে কতগুলি কঞ্চি হাতে করে তার বাড়ির চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন নিশান ধরে, তেমনি ভাবে কঞ্চিগুলি ধরা। শহরে কাগজ নেই বলেই নিশান হয়নি, শুধু কঞ্চি হয়েছে। কি একটা বলছে তারা ছড়ার

মত। লাইনের আধখানা একজন বলছে, বাকি আধখানা আর সবাই বলছে সমবেত কণ্ঠে। কান খাড়া রেখে, অনেকক্ষণ পর ধরতে পারল কথাটা :

কাঠ কেন', মূল্য দাও।
কাঠ কেন', মূল্য দাও।

অনুগ্রহ-বিদায় শেষ করে মঙ্গল এসে হাজির।

বিনাকাষ্ঠের আগুনের মত জ্বলে উঠল সুশীল। প্রথমে দপ করে, শেষে দাউ-দাউ করে।

'কোত্থেকে কাঠ নিয়ে এসেছিলে?'

মঙ্গল ধাক্কা খেল বুকের মধ্যে।

'ক বোঝা এনেছিলে?' দাম কত ঠিক হয়েছিল?

মঙ্গল থতমত খেতে লাগল।

'বলে সাতাশ টাকা। ঐ তোমার ন বোঝা কাঠ?'

মঙ্গল তাকিয়ে রইল হতবুদ্ধির মত।

'ভদ্দরলোক মাঝি না ধরে ধরতে গিয়েছিল পলিটিক্যাল মাঝি? দরিদ্র হলেই যে নারায়ণ হয় না, জানতে না তুমি? শুয়ার, ষ্টুপিড—'

মঙ্গল পাথর হয়ে গেছে। শ্বাস পড়ছে না, চোখ নড়ছে না।

'আমি অতশত বুঝি না বাপু। শিগগির এ হাঙ্গামা মেটাও। তুমি কিনে এনেছ কাঠ, তা তুমি জান। ওরা এখানে আসবে কেন? এখানে কি?'

'আমি যাচ্ছি এখুনি।' উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে মঙ্গল।

'যদি না মেটাতে পার, চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হবে বলে দিচ্ছি।'

'হুজুর—'

'কথাটি নয়। চাকরি যাবে, রেশন যাবে, সব যাবে। এ কদিন আমার ঘুম নেই, হজম নেই—আমি শুধু তোমার জন্যে বসে আছি। যদি না মেটাতে পার—'

খুঁজতে-খুঁজতে কর্মীসংঘের আখড়ায় এসে দাঁড়াল মঙ্গল।

'বাবুর কাঠের দামটা দিতে এসেছি।' বললে কাঁপতে-কাঁপতে, 'হ্যাঁ, আমি সুশীলবাবুর চাপরাশি। কত দিতে হবে?'

সর্বকণ্ঠে রব উঠল: 'সাতাশ টাকা।'

মঙ্গল ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করতে চাইল: 'না বাবু, অত নয়, শুনুন—'

'ঢের শুনেছি আমরা। সাতাশ টাকার এক পাই কম হলে চলবে না।'

'তেরো টাকা আমার কাছে আছে।' মাইনের তেরোটি টাকা বার করে দিল মঙ্গল।

'ফুঃ—' ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দিল সব। 'যতক্ষণ পুরো না দেবে ততক্ষণ বন্ধ হবে না প্রসেশন।'

মাগ্‌গি-ভাতার চোদ্দটা টাকা আছে এখনো পকেটে।

'আর পাঁচটা টাকা নিন, বাবু। ছেড়ে দিন—'

'ছাড়াছাড়ি নেই। গরিবের টাকা ঠকিয়ে নিতে দেব না। সব টাকা শোধ করে ফেলে দিতে বল বাবুকে। নইলে—'

'পায়ে পড়ি বাবু, আর দুটো টাকা নিয়ে রেহাই দিন। দয়া করুন।'

'দয়া নেই! কাষ্ঠ বলতে-বলতে সবাই কাঠ হয়ে গেছি।'

কে আরেকজন এগিয়ে এল। বললে, 'ওরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছে। ও ব্যাটা শুধু চালাকি করে দিচ্ছে না। ভাবছে, এর থেকে যদি কিছু মুনাফা মারা যায়। যত মুনাফাখোর—' এই বলে সে মঙ্গলের পকেটের উপর থাবা বসায়।

মঙ্গল হটল না, নিজের থেকেই বার করে দিল বাকি সাত টাকা।

তার এক মাসের সমস্ত রোজগার। তার বাড়ি-তৈরির কাঠ-খড়ের স্বপ্ন। তার সর্বস্ব।

সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

পর দিন থেকে বন্ধ হল শোভাযাত্রা। ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল সুশীলের। শুনতে-শুনতে ছন্দ-তাল মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজেই সে তুড়ি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে সুর ভাঁজতে লাগল, 'কাষ্ঠ কেন, মূল্য দাও। কাষ্ঠ কেন, মূল্য দাও।'

দরজা খুলেই দেখতে পেল, মঙ্গল। ভয় পেল দেখে। যেন এক রাত্রেই বুড়ো হয়ে গেছে।

কে জানে, ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি বুঝি চোখ থেকে।

সুশীলা হালকা গলায় বলে উঠল, 'গান গাও, মঙ্গল। কাষ্ঠ কেন—

মঙ্গল হাসল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট কান্নার মত 'মূল্য দাও।'

তারাই ফের ভোল বদলে এসেছে। জামা-কাপড়ে নতুন ছাঁটকাট দি
ধরতাই বুলির চেকনাই ফুটিয়ে। কমরেড সেজে। আসল রেড
কম রেড সেজে, লালচে জলে বা জোলো লালে টুপভুজঙ্গ হয়ে।

সবাই প্রায় জমিদারের ছেলে। বাপের আদায়-ইরশালে হা
দিয়ে আমদানি-সুমার ঠিক রেখে যারা পরের ধনে পোদ্দারি করতে চ
কুড়ুল মারবার সময় লক্ষ্য রাখে নিজের পায়ে না পড়ে। যারা প
মাথায় কাঁঠাল ভাঙে। কাণা গরুটি বামুনকে দিয়ে আস্ত গরুটি
বাড়ি আসে। মা সবাইর টিকিট দেখে ক্লাশ ঠিক করে-করে ঢ
দিয়েছেন। আর, যারা মার্কা-মারা নয়, নিতান্তই নেড়াবোঁচা,
টেবল-ক্লথের উপরে চায়ের দাগের মত, তাদের কোনো কলকে
তারা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি-বারান্দায়।

এ বাড়ির ছেলেরা বসতে শিখেই সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটে, মে
হাঁটবার আগেই নাচের পা ছোঁড়ে। ছেলেরা একেকটি লঙ্কা
মেয়েরা একেকটি বিচ্ছু। সবাইরই কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব, খু
খুসবো ছড়িয়ে খেয়ালের হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। কি করে হাল-না
দেখাবে এই শুধু সবাইর চেষ্টা। দাদা তাই যামিনী রায়
শোলোখভকে নিয়ে পড়েছেন, দিদি পড়েছেন ড্রাফট হিন্দু কোড নি
একেকটি পাক্কা স্নব, ভুঁইফোঁড়। সবাইর যেন জ্বর হয়েছে,
পেয়েছে। দাদা বৌদির সঙ্গে বসে মদ খান। দিদি এদিকে ক্যাপ্টো
খায়, ওদিকে হাতে-মুখে থাবা-থাবা স্নো-পাউডার ঘসে। মা
বাস্থের জন্যে বিজ্ঞাপন দেখে বম্বে থেকে পিল আনিয়ে খাচ্ছেন।
হাওয়া-লতা, মোমের মত ফুল, শাদা, হালকা।

উচিত নয় এই তাসের বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেয়া? যে

শুধু সিল্কের কুশন, পোর্সিলিন আর রবার? যেখানে সার-শস্য নেই, কেবল খোসাভূষির কারবার?

'বেশ করেছি।' টলতে-টলতে চলে গেল কুন্দকলি।

খুড়তুতো ভাই নন্দর মুখে-মাথায় ঠাস-ঠাস করে সুমন্ত্র কতগুলি এলোধাবাড়ি চড় কসাল। টেবিলের উপর থেকে দোয়াতদানটা নিয়ে গেছে সকালবেলা, সন্ধে পর্যন্ত ফিরিয়ে দেবার নাম নেই।

জায়গার জিনিসটা কখনো জায়গায় থাকবে না। জিগগেস করো, কে নিয়েছে, সবাই নির্লিপ্তের মত বলবে, আমি কি জানি। রাজ্যের লোক বাড়িতে, কাদায়-ডোবা শুয়োরের পালের মত। কারু মাথায় খুশকি, গায়ে পাঁচড়া, চোখে পিচুটি। রেলিঙে-কার্নিশে কাঁচা সেলাইয়ের কাঁথা আর দাগ-ধরা তোষক শুকোচ্ছে সারি-সারি। পেনি ফ্রক নিকার জাঙিয়া। উকুনের মত ছেলেপিলে। সংযম নেই, শৃঙ্খলা নেই, বরদাস্ত নেই। মেঝেময় পুলটিশের মত বিছানা। নোংরা আর ঝুল। হাবজা-গোবজা। মেঝেতে থুতু ফেলছে, দেয়ালে সিকনি মুছছে, আনাচ-কানাচে পিক ছুঁড়ছে। পর্দায় হাত ঘসছে। যেখানে-সেখানে জুতো-পায়ে আসছে-যাচ্ছে। যখন-তখন আড্ডা জমাচ্ছে। নতুন একটা কিছু সিনেমা এলেই দেখতে ছুটছে। ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দরজার কোণে ধুলো জমিয়ে রাখছে। ঘরে লোক নেই, তবু আলো জ্বলছে। কলের জল পড়ছে তো পড়ছেই। চৌবাচ্চার জল দু' তিন জনেই ফুরিয়ে ফেলছে। ঝাঁটাটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। কেটে পরে ঠাকুমা পুজোয় বসে ঝিমুচ্ছেন। পাশে বসে পিসিমা কেচ্ছা শোনাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে উৎপাত একটা হারমোনিয়াম, যে যখন পারছে হাপর চালিয়ে চিক্কুড় মারছে। ছেলেরা দেয়ালে পেনসিলের আঁকিবুঁকি দিচ্ছে, ইচ্ছেমত

পেরেক ঠুকছে। একঘেয়ে ইলিশ মাছ খাচ্ছে। শাশুড়ি-বৌ খেয়োখেয়ি চলছে। বউরা সকাল-বিকেল বাপের বাড়ি করছে। সোয়ামীদের ধুতি চুরি করে ছাঁদে-ছাঁদে ছাপিয়ে নিচ্ছে। চলছে ছেলে কেঁড়েলি, মেয়েদের ন্যাকামো।

'কেন ওকে মারছ?' বড় কাকি তেড়ে আসেন।

'বেশ করছি। ও কেন দাঁত না মেজে খেতে আসে?'

ও কেন নখ খায়? ও কেন শিস দেয়? ও কেন কান চুলকোবার সময় বিশ্রী শব্দ করে? কেন পা দোলায়? দাঁত খোঁটে? ও কেন কারণে-অকারণে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে গান গায়, নাচের পোজ করে?

সুমন্ত্র একা। বেকার। বাপ উকিল হতে বলেছিল, শোনেনি। পার্টির কাজ করে। টো-টো করে টহল মারে। মাঝে-মাঝে বক্তৃতা দেয়। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে। ও সে-ই খাটে। আটপিটে, পোড়খেকো ছেলে, হ্যাণ্ডবিল বিলোনো থেকে সুরু করে মেগাফোন মুখে নিয়ে ঘোষণা করা পর্যন্ত সেই এক নম্বর। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, চুল উস্কখুস্ক, মুখে কথার তারাবাজি। তর্ক করতে গেলে এক কথায় হটিয়ে দেয় সবাইকে: 'পড়েছেন কিছু?'

যেটুকু সময় বাড়িতে থাকে, গুতুনে গরুর মত সমস্ত ঢিলেমির পিছনে ঢুঁ মারে। অসম্ভব একে সজুত করা। কলকে উপুড় করে পোড়া তামাক ঢেলে ফেলে নতুন তামাক সাজতে হবে।

'এবার কিছু টাকা রোজগারের পথ গ্যাখ।' মা ফর্দ নিয়ে বসেন।

বামুন, দুটো চাকর, দুটো ঝি, তায় জা-রা কেউ রান্না করবে না, ঠাকুমার জন্যে রাঁধুনি। মাসের মধ্যে দুটো সাধ, দুটো ছেলের মুখ-দেখা, দুটো বিয়ে। ডাক্তার, নার্স, ধাই।

'হরিণও শিং বদলায়, ওর বদল নেই।' বাবা টিপ্পনি কাটেন।

বাবা চোরাবাজারে চালান-খালাসের ঠিকাদারি করেন। কাকারা কেরানি। সব একেকটি নিরেট গোলা। না বা হিন্দু মহাসভা। একেবারে নট-নড়নচড়ন।

ঝাঁকানি দিয়ে নড়িয়ে দিলে শুধু চলবে না। সমূলে নির্মূল করতে হবে।

বালিচুণ খসেছে, খিলেন ফেটেছে, কার্নিশ চটেছে, ভিত দমেছে, দরজায় ঘুন ধরেছে. কিন্তু বনেদ বড় মজবুত। এ বনেদ খুঁড়ে ফেলা যায় না? ভেঙে ফেলে দেয়া যায় না এর গাঁথনি? জীবনের কোরা রং আর শাড় তুলে ফেলে দিয়ে লাল রঙে ছুবিয়ে নেয়া যায় না?

কুন্দকলি ঘোষণা করল, বিয়ে করবে।

এ একটা এমন কি নয়া জিনিস? যার জন্যে এত হাঁসফাঁস, এত উসিপিসি। এমন একটা চেহারা করেছে যেন ঝড় মাথায় করে ঘুরছে। বিয়ে করবে তো এত হৈ-হুজ্জত কিসের?

কমরেডদের কম্পজ্বর সুরু হল। কার ভাগ্যে না শিকে ছেঁড়ে। আর যাই হোক, কুন্দকলি নিশ্চয়ই নিজের কোট বজায় রাখবে। সীমানা-সরহদ্দ পেরিয়ে যাবে না।

না। ততটুকু মাত্রাজ্ঞান তার আছে।

স্পষ্টাস্পষ্টি নাম বললে কুন্দকলি।

একেবারে ছেঁড়া শার্ট, ঘসা জুতো, খড়ি-ওড়া চেহারা। জাতে-ঠেলা। এত সব কেষ্টবিষ্টু থাকতে এই হেঁজিপেঁজিকে? এত সব কাশ্মিরি ফতুয়া, মারাঠি চটি ও লাখনৌয়ি পাজামা—সব উবে গেল? একেবারে

নামকাটা সেপাই না হলেও নিধিরাম সর্দার তো বটে। সে মারল কেল্লা?

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রত্নাবলী। বললে, 'রাজ্যে তুই আর লোক পেলিনে?'

'না।'

'হাটের রাস্তা থেকে শেষকালে তুই একটা কাণাকড়ি কুড়িয়ে নিলি? চালাবি কি করে?'

'যে খেলে সে কাণাকড়িতেও খেলে।' কুন্দকলি গভীর সুরে বললে।

'তাই বলে আটঘাট বাঁধবি নে? ভেসে যাবি?'

'আমার ইচ্ছে।'

মানে কি এর? বিদ্রোহ?

তার চেয়ে সটান জেলে যা না। ঢের ভদ্র দেখাবে। বনে যা না, বলতে পারব, বাঘে খেয়েছে। পাগলাগারদেও যদি যাস, বলা যাবে, মাথার ব্যামো হয়েছিল, উপায় কি! কিন্তু এ কি কেলেঙ্কার!

ভালোবাসা? ভালোবাসলেই বিয়ে করতে হবে? লাথির ঢেঁকিকে চড়ে তুলতে হবে? জগতের কেউ শুনেছে এমন কথা? অমিতকে বিয়ে করেছিল লাবণ্য?

মা কেঁদে-কেঁদে একসা করলে।

'রূপ-গুণ না দেখিস পকেটটাও তুই দেখবিনে?'

'মোটা ভাত মোটা কাপড়ই আমার বেশি।' কুন্দকলি গর্বের সঙ্গে বললে।

কি মামুলি! কি সেকেলে! একেবারে সাজানো কথা।

'মোটা ভাত জড়িয়ে গেলে গলা দিয়ে যে উল[illegible] না পোড়ারমুখি। রত্নাবলী ঝামটা দিয়ে ওঠে।

'ফ্যানসা ভাতেই সুগন্ধের ধোঁয়া উড়বে।'

কথার পিঠে কথা বলতে হয় বলেই বলছে, নইলে এর কোনো তাগবাগ নেই।

বাবা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

কুন্দকলি বলে, 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পার বাড়ি থেকে, কিন্তু আমার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করতে পার না।'

'তাড়িয়ে দেব কি! শেকল দিয়ে বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে রাখব।'

এই ফ্যাসিজম। এরই উৎখাত চাই।

কমনসীব কমরেডরা অভয় দিল, আমরা বাগড়া দেব। চাই কি, গুম করে ফেলব।

মুণ্ডমালার দাঁতখামাটিতে কুন্দকলির ভয় নেই।

সবাই ভাবে, এত জোর মেয়েটা পায় কোথা থেকে? এতদিনের মাটি-জল ব্যর্থ করে এ কি আগাছা জন্মাল? ভালোবাসা কখনো এত উজবুক হয়? এ স্রেফ কেরদানি। ডেঁপোমি। নাড়াবুনেকে বিয়ে করে কিত্তনের মহিমা দেখানো। শুধু পরিবার ভেঙে দেবার বাহাদুরি। পরিবারই হচ্ছে ক্যাপিট্যালিজমের গোড়াপত্তন। তার আইনকানুন, নীতিজ্ঞান, শিল্পজ্ঞান, এমন কি সৌন্দর্যবোধ—সব কিছুই খাস্ত। বরবাদ করো। শুধু ধার-করা বুলির চোটাপট।

সুমন্ত্র বলল, বিয়ে করব এত দিনে।

ভেরেণ্ডা ভাজব। কথাটা যেন এমনি শোনাল। প্রাণ নেই, আহ্লাদ নেই, যেন আদায়ী-অনাদায়ী সমস্ত পাওনা-দেনার হিসাব-পত্র বুঝসমুঝ হয়ে গেছে। যেন সর্তহীন সাদা সাফ কথা, বিয়ে করব।

গরলায়েক কি ফৌতফেরারি, আবাদি কি হাজাশুকা, নোনাশিকস্তি ন
নদীগত, কোনো জিজ্ঞাসা নেই, ওজর-আপত্তি নেই—বিয়ে করব।

সবাই লাফিয়ে উঠল। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়, তেমনি সবাই জানত সুমন্ত্রর ও স্ত্রী-ভয় নেই। কিন্তু এ কি, বাজে তাসও তুরুপ হয়ে উঠল। আর, শোনো, কাকে বিয়ে করছে!

মস্ত বড় লোকের মেয়ে। পটের বিবি। মিহি শাড়ি পরে পেটো-পাড়া চুল বেঁধে কোমর বাঁকিয়ে চলে। না লো, চুল ছাঁটা, ভুরু কামানো বরাখুরে। খাটো-খাটো শাড়ি-জামা পরে যাতে আঁটোসাঁটো দেখায় বেশি চলতে-ফিরতে হয়, রপট-দাপট খুব। কোনোদিন দেখিসনি রাস্তায়? বস্তি ঘুরে-ঘুরে দস্তখৎ নেয়। কয়লা বিলোয়। স্টিরাপ পাম্প কি করে চালাতে হয় শিখিয়ে গেল সেদিন! অফিস-টাইমে সাইরেন বাজলে কি করতে হবে মেয়েদের, ঐ লেখাটা তো ওরই! ও মা, ঐ মেয়েটা? ও তো কামাখ্যার মেয়ে! হাড়ে ভেলকি খেলে।

মা কেঁদে পড়েন: "অসম্ভব। ওরা বামুন আমরা কুণ্ডু। তা ছাড়া ঐ ধেয়ে-নাচুনী মেয়ে—'

বড় কাকি বলেন: 'প্রতিলোম বিয়ে।'

'জানতুম আগে।' ছোটকাকি বলেন হাত ঘুরিয়ে: 'উপরে চিকনচাকন, ভেতরে খ্যাঁড়।'

'কিন্তু খাওয়াবে কি?' মেজকাকি ঝলসে ওঠেন: 'সস্তাগণ্ডার বাজার নয় এখন।'

'তোমাদের ভাবতে হবে না।' যেন এও একটা জটিল রাজনীতির প্রশ্ন এমনি ভাবে সুমন্ত্র সবাইর পাশ কাটায়।

কিন্তু বাড়ির কর্তাকে ভাবতে হবে। এখন তাঁর তপ্ত খোলা, তাই

খাঁই বড়। বলেন, 'জাত না মানি, টাকা মানি। শ্যামকুল দুইই ছাড়তে পারব না। নগদ টাকা নিতে হবে।'

'ভালোবাসায় আবার টাকা চলে নাকি?' কাকারা চিপটেন কাটেন।

চালাক-চোস্ত ছেলে হলে এরি মধ্যে টাকার জোটপাট করে নিতে পারে। ঐ তো যোগেন ডিপটি ছেলেকে কেমন টুইয়ে দিয়ে মেয়ের বাপের থেকে বিষয় হাঁকড়াল। মাজা বুদ্ধিই নয় ওর কোনো কালে। সর্ব কর্মে ঘুন। যাই বল, টাকার খাতিরেই ফেরফার করতে পারি। কারবারের হেপায় আণ্ডিল হয়েছে মেয়ের বাপ, তাকে ছাড়াছাড়ি নেই।

'বিয়ে করছি আমরা, তাতে বাপেদের কি?' সুমন্ত্র বললে গম্ভীর হয়ে।

বাপেদের কি তো পথ দেখ। কাকারাও বাবার হাইয়ে তুড়ি দিলেন। এ বাড়িতে জায়গা কোথায়? নিজেরাই কোনোরকমে মাছ-পাতুরি হয়ে আছি।

এমন জং-ধরা ভোঁতা বুদ্ধি দেখা যায়নি কোনো কালে। ওদের পালের যে গোদা সেই তো বিয়ের সময় দমসম দিয়ে টাকা নিয়েছে। আরে, নে-খোর সময়ই তো এই! সাতমুলুক টাকা নিয়ে কই দামামা বাজাবি, তা না, শুকনো পেটে হাঁড়ি বাজাতে বসেছিস।

সত্যিই, ভাবতেও পারত না কেউ। পার্টির বাইরে আর ওর পৃথিবী ছিল না। নিতান্ত কাটখোট্টা, গোঁয়ারগোবিন্দ, রসকস কোনো দিন কিছু নেই। তার প্রেম? তার হৃদয়? গরুর গাড়িতে পিয়ানো? তবে ও জোর পাচ্ছে কোথা থেকে? কোন স্বপ্ন? কিসের সাধনা?

বুঝেছি, আর কিছু না পার, প্রথমে প[illegible]িবার ভাঙো। পিলপেগুলো আলগা করে দাও। হালে ঝিঁকে মেরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চল।

নতুন বিয়ে করেছে রমজান। বউয়ের নাম হাস্তবিবি। সব সময়েই হাসে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও হাসে কি না বাতি জ্বালিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে রমজানের।

কুপি আছে। দিয়াশলাইও আছে। কিন্তু কেরাসিন কই?

পাশেই হাতেম শা'র দোকান। আগে কাঠ বেচত। কেরাসিন বেচত। এখন ভেলি গুড় বেচে। বেচে খোসাভূষি।

'ক্রাচিন এল দোকানে?'

'কোথায় ক্রাচিন!' হাতেম শা বিতৃষ্ণার ভঙ্গি করে।

জবাব শুনে রমজান যেন খুশি হতে চায় না। ইতি-উতি করে।

'চাষার ঘরে আবার ক্রাচিনের দরকার কি? কোনোদিন বাতি জ্বেলেছিস রাত্তিরে?'

'সময়ে-অসময়ে জ্বালতে হয় তো তবু!'

'নে, নে, রাখ। পান্তা-পোড়া-খাওয়া চাষা, তার আবার ক্রাচিন তেল! তার চেয়ে গিয়ে ঘিয়ের বাতি জ্বাল না!' হাতেম শা দাঁত-খামাটি দিয়ে ওঠে।

সত্যি, তাদের ঘরে রাত্রে আবার কবে বাতি জ্বলল! তার বাবা অত্যন্ত ছোট চাষা, হাল-গরু বেগার নিয়ে মুজরো কবুলতিতে জন খেটেছে এ বছর। হাতে-লাঙলে সে বাপের সাহায্য করেছে, তবু তাদের প্রায় দিনান্তর খাওয়া হয়নি। জমি অল্প, তায় ধানগাছে এত অতিরিক্ত তেজ হয়েছিল এ বছর যে, ধান ফোলেনি, ধানে দুধ হয়নি। এক কাটি ধান কর্জ এনে খন্দের সময় দেড় কাটি ফিরিয়ে দেবে এই কড়ারে পেট চালিয়েছে। তাদের কি না কেরাসিনের কুপি! সত্যি, আজগুবি শোনায়।

তবু, এ বছরই কত মাৎবর চাষা রাজা হয়ে গেছে। কুপি থেকে

চলে এসেছে হেরিকেনে, খোড়ো চাল থেকে টিনের চালে। ছেড়ে চিনি ধরেছে, বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। ঘোড়া কিনেছে কেউ। কেউ বা কলের গান। আর, প্রায় সবাই একটা, তিনটে, চারটে পর্যন্ত বিয়ে করেছে। কুমিল্লা-ফরিদপুর থেকে রা মেয়ে এসেছে চালান হয়ে।

রমজানের শুধু একা এই হাস্য। এত অভাব-উপোসের ম যে হাসে।

রাত্রে একেক সময় মুখখানা তার দেখতে ইচ্ছে করে। মুখ, আনন্দের মুখ। দিনের মুখে রাতের মুখের চিহ্নটিও থাকে না।

দুই কমিউনিস্ট কর্মী গাঁয়ে এসেছে কেরাসিনের ফর্দ করবার জ হপ্তায় কার কত তেল লাগতে পারে, তার তায়দাদ। বলে, 'এ আর কারু ভাবতে হবে না। আমরা এসেছি। দেখবে গাঁয়ে আ দেয়ালি জ্বালব। কি, কত লাগবে তোমার?'

'এক কুঁপো।' রমজান কৃতার্থের মত বলে।

তার গায়ে খোঁচা মেরে হাতেম ধমক দিয়ে ওঠে: 'বল এ বোতল। বাইশ ইঞ্চি বোতল। তেল হাতি-মার্কা।'

তেলের এজেন্ট হীরেলাল সারখেল এসেছে ডিপোর বাবু চুনীল সিকদারের কাছে তালাস-তদবিরের জন্যে। দশ দিনের উপর কলকাতায় বসে, অথচ মাল বেরুচ্ছে না গুদোম থেকে।

'ক-টিন আপনার?'

'শাদা ছ শো, লাল চার শো।'

'পঞ্চাশ টিন ছেড়ে দিতে হবে মশাই।' চোখ ছোট করে চারদিকে তাকায় চুনীলাল।

না, একেবারে মুফৎ যাবে না। দামের যা পড়তা পড়ে, তার কিছু কম দিয়ে চুনীলাল পঞ্চাশ টিন কিনে নেবে হীরেলালের থেকে। আর সেগুলি, সোজা কথা, সটান চালান হবে কালোবাজারে। একেক ফোঁটা তেল একেক ফোঁটা রক্তের মত মনে হবে। কি, রাজি?

উপায় কি! রোমে এসে গ্রীক সাজলে চলবে না।

ওয়াগনে হাজার টিনই ঠিক এসেছে, কিন্তু তার পঞ্চাশ টিনই খালি। হীরেলাল জেলার কর্তাকে মোকাবিলা রেখে মাল খালাস নিল, কিন্তু ডিপোয় নালিশ পাঠাল না। সাব্যস্ত হল লিকেজ, ঝড়তিপড়তি, টুটাফুটা। রেলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হল সবাই।

হিসেবে ছাঁট পড়ল পঞ্চাশ টিন। বাঁট হল সাড়ে ন শোর বনিয়াদে।

এজেন্টের নিচে ডিলার। দীননাথ নন্দী। ইয়াদালি ফরাজী।

'তোমার ছাড় কত?'

'লাল চল্লিশ, শাদা বিয়াল্লিশ।'

'তোমার?'

'লাল আটাশ, শাদা বায়ান্ন।'

মোট আটষট্টি আর চুরানব্বই। হীরেলাল মনে-মনে হিসেব ঠিক করে ফেলে। শতকরা কুড়ি নম্বর করে ছাড়তে হবে। একেবারে খালি না চলে, আধা-ভর্তি টিন নিয়ে যাও। গায়ে দাগ কাটা আছে। কি, রাজি?

উপায় কি! নইলে মাল আসে না হাতে।

টিন সব শিল করা, মুখ বন্ধ, কিন্তু সবগুলিই ঢকঢক করছে। কেউ

পেট পর্যন্ত ভর্তি, কেউ বড় জোর গলা পর্যন্ত। মাথা-সই কেউ না।

কালোবাজার পিছল হয়ে ওঠে।

ডিলারের নিচে ইউনিয়ন-ডিলার। বামাপদ করন। আমা

হাতেমালি শা।

'কত তোমার ইউনিয়নে?'

'লাল কুড়ি, শাদা দশ।'

'তোমার?'

'ঐ রকম।'

দীননাথ ধমকে ওঠে। ইয়াদালি চোখ পাকায়।

'অত নিয়ে করবি কি শুনি? লাগবে নাকি অত? কত লে

সত্যি বাতি জ্বালায় তোদের দেশে?'

তা তো ঠিকই। বামাপদ আর হাতেমালি ফিক-ফিক করে হাসে

'চাষার ঘরে বাতি জ্বলবে, না, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলবে!'

তা, করতে হবে কি তাই বলো না।

'আদ্দেক বিক্রি করে যা আমাদের কাছে।'

নিশ্চয়ই। অত টিনের গাহেক কোথায় গ্রামে? দরকার থাকে

দরকারের বোধ কই?

উপায়ও নেই তা ছাড়া। খাতিরখাতরার লোক তারা, কেউ পা

বাবুর, কেউ বা বোর্ডের মেম্বরের, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে

করে নিয়েছে। দাম যদি একটু চড়া পায়, হাত-ফেরতা না করেই বি

করে দেয়া মন্দ কি।

তিরিশ টিনের মধ্যে পনেরো টিনই বিক্রি হয়ে য-য গ্রামে না যেতে

দীননাথ-ইয়াদালির আড়তে বসেই।

কেরাসিনের সোতা খাল বয়ে যায় কালোবাজারে।

তারপর যে কয় টিন গাঁয়ে আসে তারো কতক জড়ো হয় গিয়ে হয়ত পাটাতনের নিচে, গুড়ের হাঁড়ির আড়ালে।

'চাষার ঘরে আবার ক্রাচিনের দরকার হল কবে? কোনো দিন বাতি জ্বেলেছিস রাত্তিরে?' রমজানকে মুখঝামটা দিয়ে ওঠে হাতেমালি।

কমিউনিস্ট কর্মীরা সাবডিভিশনাল ফুড-কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছে। কোনো অসাম্য তারা বরদাস্ত করবে না। গাঁয়ের লোকদের তারা চিনি খাওয়াবে। রাত্রে তাদের ঘরে জ্বালাবে কেরোসিনের ফুটফুটে আলো।

শুধু শহরের লোকের জন্যে ভাবনা। যত উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-মাস্টার, দোকানদার, হোটেলওয়ালার প্রতি পক্ষপাত। যত মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি। আর গ্রাম রইল অন্ধকারে। অবহেলার অন্ধকারে। কর্মীরা পায়জামার দড়িতে জোরে গিঁট বাঁধল।

অনেক চেঁচামেচি করে অনেক টেবিল চাপড়ে গ্রামের বরাদ্দ তারা বাড়িয়ে নিল কমিটির থেকে। শহরে যদি একশো টিন লাগে, মফস্বলে কম করে লাগবে তবে হাজার। পাঁচ : এক—সমস্ত একত্র ধরলে গাঁয়ের লোকের অনুপাত এর চেয়েও বেশি। ঢোলশহরৎ করে গাঁয়ে রেশনিং চালু হল, বাড়ি প্রতি হপ্তার বরাদ্দ হল এক ছটাক থেকে আধ সের। গ্রামে এবার এল বুঝি দীপান্বিতা।

সাবডিভিশনাল ফুড-কমিটির নিচে গ্রাম্য রেশন-সমিতি। কমিউনিস্ট কর্মীর কাণ্ডে তারা হাততালি দিলে। যত বেশি, ততই বেসাতের সুবিধে। আর কে না জানে, তাদের খাতিরের লোকেরাই

ইউনিয়ন ডিলার। প্রেসিডেন্ট রহিম বক্স খোন্দকারেরই লোক এই হাতেমালি।

কিন্তু কে কোথায় চায় কেরাসিন! জোর করে তুমি গছিয়ে দিতে পার, কিন্তু কেনাতে পার না। অভাবের বোধ আনতে পারলেও কেনবার ক্ষমতা আনতে পার না। রমজানের মত অমন বেআক্কেল কবিত্ব কার আছে এই বন-বাদায়! সন্ধ্যের সময়েই যেখানে ঘুম আর যেখানে এক ঘুমেই প্রত্যূষ, সেখানে মাঝরাতে আলো জ্বেলে বউয়ের মুখ কে দেখতে চাইবে!

তাই কার্ডে ধরা থাকলেও বেশির ভাগ লোকই আসে না নিতে কেরাসিন। তাই অনায়াসেই হাতেমালি আদ্ধেক টিন দীননাথের ঘরেই বিক্রি করে আসে। বাড়তি সেই তেল কালোবাজার আলো করে। জলে পাতালের অলিতে-গলিতে।

কিন্তু আসে তাঁতিরা। মুচিরা। নৌকোর মাঝিরা। রাত্রেও যাদের জীবিকার খেয়া, জীবিকার ফোঁড়, জীবিকার টানা-পোড়েন বন্ধ হয় না। তাদের কারুর কার্ড নেই; থাকলেও যা বরাদ্দের নমুনা, দু'রাত্রেই ফুরিয়ে যায়। তাই তারা মাঝে-মাঝে, অসহ্যের সময়, খিড়কির দরজায় এসে এক হাতে মুখের আধখানা ঢেকে জিগগেস করে, 'দাম কত বোতলের?'

'লাল পাঁচ সিকে, শাদা দু'টাকা।'

আস্তে-আস্তে তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। মুচি ক্ষেতে গিয়ে জন খাটে। তাল-বেতের কারিকররা খোল-কত্তাল গায়। নৌকো নোঙর ফেলে চুপ করে বসে ঢেউ গোনে।

তবু বিক্রি হয় পাঁচ সিকে থেকে দু'টাকায়। মোড়ল-মাতব্বরের

বাড়িতে। যখন খাওয়া-দাওয়া ঘটে, ঘটে বিয়ে-সাদি, পাল-পার্বন। যখন লুঠতরাজ হয়। ডাকাত আসে মশাল জ্বালিয়ে।

রাত্রে হাসুবিবি মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। গুঙিয়ে ওঠে।

পেটে তার কি একটা দগদগে যন্ত্রণা। কখনো কাটা ছাগলের মত হাত-পা ছোঁড়ে, কখনো গুটিয়ে পাকিয়ে যায়। কখনো হাতে-পায়ে খিল ধরে থাকে।

'হাসু, কথা ক, কি খেয়েচিস আজ তুই? এমন করছিস কেন?'

মুগ আর মরিচের মৌশুমে পরের ক্ষেতে ফসল তুলে বাপে-পোয়ে যা পেয়েছে, তাই খেয়ে কাটিয়েছিল কয়েক মাস। তাও শেষ দিকে আকাঁড়া চালের জাউ খেয়ে। রোগে-রোগে কাহিল্ হয়ে গেছে দু'জনে। আর কেউ জন ধরে না তাদেরকে। ষ্টিমারঘাটে গিয়ে সর্দারের জিম্মায় কুলিগিরি করে। হালকা মালের তালাস দেখে। খাঙ্গা খাঁরাও আজকাল হালকা বোঝা কাঁধছাড়া করে না।

আকাঁড়া চালের জাউও বুঝি জোটে না আর। কাজীর হাঁড়িতে মুঠাখানেক চাল ছিল, তাই শিলে বেটে ফেনের মত একটু-একটু কদিন রান্না করেছে হাসু। তারপরে আজ ছ'-সাত অক্ত উপোস। টানা উপোস। চেহারা কি রকম বিগড়ে গিয়েছে তার!

খিদের তাড়নায় নিশ্চয়ই কিছু একটা খেয়েছে হাসু। আর কাউকে না দিয়ে। না জানিয়ে।

বিচেকলার কাঁদিটা কাটা দাওয়ার উপর। সামনে বঁটি। কটা কাঁচা তেঁতুল।

বুঝতে আর দেরি হয় না। কাঁচা বিচেকলা কুটে কাঁচা তেতুলের

সঙ্গে সেদ্ধ করে খেয়েছে হাসু। খেয়ে অবধি কি হয়েছে তার, কে বলবে।

রাত্রের হাসি কখনো দেখিনি, কিন্তু কান্নাটাকে দেখব। রমজান হাতেম শার দোকানে ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়ায়।

'একটু ক্রাচিন দেবে মাৎবর?'

হাতেম শা আঁৎকে ওঠে: 'ক্রাচিন দিয়ে তুই করবি কি?'

'বউটার অসুখ, মাৎবর। বড় কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।'

'তা তেল দিয়ে মালিশ করবি নাকি?'

'না, আলো জ্বালব।'

কথাটা রমজানের কানেই কেমন বেখাপ্পা শোনায়। চাষার ঘরে সন্ধ্যের সময়েই যেখানে ঘুম, আর যেখানে এক ঘুমেই প্রত্যূষ, সেখানে আবার আলো কিসের?

কিন্তু ব্যথার তাড়নায় হাসু মাঝেমাঝে উঠে দাঁড়ায় শোয়া ছেড়ে। এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়, টলে পড়ে। ফের ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ে ছটফট করে। গায়ে হাত দিলে জ্বর মালুম হয়।

আলো না হলে ধরবে করবে কি করে? হাঁপিয়ে ওঠে রমজান।

হাতেম শা ভুরু কুঁচকে তাকায় খানিকক্ষণ। শেষে কি ভেবে বলে, 'নেই ক্রাচিন। মালই আসে না—'

'তবে প্রহ্লাদ প্রামানিককে দিলে যে দেখলাম।' রমজান কাট-কাট গলায় বলে।

'তা, ওর বাড়িতে কলেরা—'

'আমার বাড়িতেও তো তাই। দাস্ত-বমি নেই, কেঠো কলেরা।' রমজান সিধে হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

'ও বোতল আড়াই টাকা করে দিয়েছে। তুই দিবি তাই? পয়সা থাকে তো কবরেজ ডাকা। বালি-সুজি কিনে দে।'

কিন্তু আজ বালি-সুজির বদলে ধুলো। কবরেজের বড়িতে কবরের মাটি।

আজ রাতে হাস্তের আর্তনাদ কথা পেয়েছে। বলছে, 'তুমি কোথায়? আমার চোখ টেনে নিচ্ছে, ফাঁপর করছে আমার। ওগো আমাকে দেখ—তাকাও আমার দিকে।'

পাথরের মত শক্ত অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

হাস্তু হাত বাড়ায়। আশ্চর্য, রমজান কোথাও নেই!

যে করে হোক, সে আলো আনতে গেছে। দেখবে সে রাত্রের মুখ।

হঠাৎ বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে লাল মেঘের ঝড় উঠল আকাশে। ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে যেন টাটকা সূর্য উঠছে। রাতের অন্ধকার কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে গেছে ধোঁয়া হয়ে।

কি ব্যাপার? হাতেম শার গুড়ের আড়তে আগুন লেগেছে। গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে লাল কেরোসিন।

রমজান চলে এসেছে হাস্তুর পাশটিতে। এবার দেখবে সে হাস্তুকে। যে হাস্তু এখন ঘুমে, যার মুখ এখন অন্ধকার।

বস্ত্র

'যাই বাবু, আদাব।' কাঠের ছে দিচ্ছিল মোবারক, ঘাসের উপর ফেলে-রাখা জামাটা কাঁধের উপর তুলে নিল হঠাৎ।

'চললি এখুনি ?'

'হ্যাঁ, বাবু। বাড়ি যেতে-যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। লাশ-কাটা ঘর, চিতাখোলা, সব পথে পড়ে। বাবাজান বলে দিয়েছে আন্ধার না নামতেই যেন বাড়ি ফিরি। রাস্তাটা ভাল নয়।'

মোবারক উমেদার-পিওন। অল্প বয়স। দাড়িগোঁফের রেখা পড়েনি এখনো।

সেই মোবারকের অনেকদিনের আগেকার পুরোনো কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ, নালতাকুড়ের পথে এসে। বেড়াতে-বেড়াতে কতদূর চলে এসেছি খেয়াল করিনি। এবার ফেরবার পথ ঠাহর করতে গিয়ে দেখি আঁধার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। জ্যালজেলে দিনের আলোর পর হঠাৎ আঁধারের ঠাসবুনন।

কেমন ভয় করতে লাগল। আজ হাটবার নয়, পথে জনমানুষ নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

সামনেই চিতাখোলা। লাশ-কাটার ঘর। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দু'ধারে লটা ঘাস। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে লাগলুম।

বিশাল, বলিষ্ঠ একটা পাহাড়ে-গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের থেকে নাকি ভূত নামে। হেঁটে বেড়ায়। মোলাকাৎ করে। কথা কয়।

হাতে টর্চ আছে। তাতে যেন বিশেষ ভরসা হল না। মনে হল, অন্ত অস্ত্র কিছু নিয়ে এলে হত পকেটে।

ভাবছি এমনি, সামনেই তাকিয়ে দেখি, ভূত। স্পষ্ট ভূত। গাছ

থেকে নেমে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু দস্তুরমত হাঁটছে সমুখ দিয়ে। কিন্তু যেন হাঁটতে পারছে না। ঢ্যাঙা, লিকলিকে হাত-পা। আর, আগাগোড়া কালো, একরঙা। ঠাহর করতেই মনে হল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে গায়ের রক্ত শাদা হয়ে গেল।

টিপলুম টর্চ। আলোর সাড়া পেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে ততখানি যেন শক্তি নেই। গাছ থেকে নেমে এসেছে একথা ভাবা যায় না। যেন নিজেই ভড়কে গেছে। হাঁটু মুড়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল হঠাৎ।

এ নগ্নতাটা আতঙ্কের নয়, হাহাকারের। মৃত্যুর নয়, সর্বাপহরণের।

স্বচক্ষে ভূত দেখবার সুযোগ ছাড়া হবে না। যখন সে ভূত মিলিয়ে যায় না, গাছে ওঠে না, পথের পাশে বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

টর্চের আলোটা নিবিয়ে ফেললুম তাড়াতাড়ি। কেননা লোকটাকে চিনতে পেরেছি।

বুড়ো ছাদেম ফকির। অনুদয়ে গেয়ে-গরুর দুধ দুয়ে আমার বাড়িতে জোগান দিত। বলেছিল একদিন, 'কাপড় পাওয়া যাবে বাবু?'

বলেছিলুম, 'রেশন-কার্ড যাদের আছে তারা পাবে একখানা। বাড়ি প্রতি একখানা। আছে তোমার রেশন-কার্ড?'

'আছে।'

'কিন্তু তুমি তো মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে। আমরা এক ·াট যা ধরেছি চোরাবাজারে, তা বিলোচ্ছি শহরের লোকদের।'

'আমাদের তবে কি হবে?'

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলুম, 'সার্কেল-অফিসার সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ কর।'

তারপর আর আসেনি ছাদেম। সেদিন কোমরের নিচে এক হাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নিশ্চয়ই নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। আজ একেবারে তন্তুহীন।

ওর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোক আছে। নইলে ও কাঁদে কেন? নইলে ওর লজ্জা কিসের?

কিন্তু ওখানে ও করছে কি?

দু'একটি লোক এসে জুটেছে। একজন কদমালি, আদালতের রাতের চৌকিদার। চলেছে শহরের দিকে। ভেবেছে, চোর-ছেঁচড় কাউকে ধরেছি বোধ হয়। কিন্তু চোর যদি বা কাঁদে, অমন কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে কাঁদে কেন? কদমালি থমকে দাঁড়াল।

'জিগগেস করো তো, করছে কি ও ওখানে?'

'আর কি জিগগেস করব!' কদমালি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বলল, 'শ্মশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়েছে। যদি পায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো বা বালিশের খোল—'

বললুম, কেন বললুম কে জানে, 'আমার বাড়িতে যেয়ো কাল সকালে। কাপড় দেব একখানা।'

আমার রেশন-কার্ডের বনিয়াদে কাপড় জোগাড় করেছিলুম একখানা। খেলো, মোটা কাপড়, পাড়টা বাজে। যদিও সেটা আমার পরবার মত নয়, তবু সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। চাকর-ঠাকুরের কাজে লাগবে সময় হলে। নিরবশেষ দান করব এমন সংকল্প ঘুণাক্ষরেও ছিল না। কিন্তু মৃত নয়, রুগ্ন নয়, স্বাভাবিক সুস্থ একটা মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকবে এর অসঙ্গতিটা মুহূর্তের জন্যে অস্থির করে তুলল। মানুষ

দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার দারিদ্র্যের চিহ্ন যে ছিন্নবস্ত্র, তার নিদর্শন-টুকুও সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ?

কিন্তু কাল ও আমার বাড়ি যাবে কি করে কাপড় আনতে ? ও যে এখন সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত গোঁজামিলের বাইরে।

কদমালিকে বললুম, 'ওর বাড়ি চেন ?'

'এই তো সামনে ওর বাড়ি।' খানিকটা জঙ্গলে অন্ধকারের দিকে সে আঙুল তুলল।

পরদিন কদমালির হাতে নতুন একখানা কাপড় দিলুম। বললুম, 'খবরদার, ঠিকঠাক পৌঁছে দিও ছাদেম ফকিরকে। পাড় কিন্তু আমার মনে থাকবে।'

পাঁজিতে লেখে, শুভদিন দেখে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। কত শুভদিন চলে গেছে পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কিন্তু ছাদেমের হৃতবস্ত্র এল না নতুন হয়ে।

আজ নিশ্চয়ই ছাদেম ফকিরের মুখে হাসি দেখব। আজ নিশ্চয়ই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে আমাকে সেলাম করবে।

সন্ধের মোহানার মুখে দিনের হাল ছেলতে-না-ছেলতেই বেরিয়ে পড়লুম লালতাকুড়ের পথে। চলে এলুম শ্মশান পেরিয়ে।

কোন জায়গায় ছাদেম ফকিরের বাড়ি আন্দাজ করে দাঁড়ালুম কাছাকাছি। কাছেই ছোটখাট একটা ভিড়। ফিসির-ফিসির কথা।

কেউ কতক্ষণ দাঁড়ায়, দেখে, তারপর চলে যায়।

দেখলুম কদমালি আছে কিনা। কদমালি এখনো বেরোয়নি লণ্ঠন হাতে করে, তার রাত-পাহারায়। যারা জটলা করছে তাদের কাউকে চিনিনা।

এগিয়ে গিয়ে শুধোলুম, 'কি ব্যাপার ?'

'ঐ দেখুন।'

তখনো গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেখলুম একটা সাধারণ আম গাছ। তারই একটা ডালে কি-একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির।

তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।

কয়েকজনকে সঙ্গে করে এগোলুম গাছের নিচে। সন্দেহ কি, ছাদেম ফকিরের গলায় আমারই দেয়া সেই নব বস্ত্র। গলা ঘিরে দেখা যাচ্ছে সেই তীক্ষ্ণ লাল পাড়।

এরি জন্যে কি কাপড়ের দরকার হয়েছিল ছাদেমের ?

বললুম, 'বাড়ি কোনটা ওর ?'

জঙ্গলের মধ্যে একখানাই শুধু ভাঙা কুঁড়েঘর সেখানে। সবাই বললে, 'ঐ তো।'

মাতবর-মতন একজনকে ডেকে জিগগেস করলুম, 'ওর বাড়ির লোকেরা জানে ?'

'কেউই নেই বাড়িতে। কাউকে দেখতে পেলুম না—'

'কতক্ষণ থেকেই তো ঝুলছে।' বললে আরেকজন।

সত্যি, একটা টুঁ শব্দ নেই কোথাও। কেউ একটা কান্নার আঁচড় কাটছে না। আশ্চর্য! তবে কাল কি ছাদেম কেঁদেছিল নিজে মরতে পারছেনা বলে ?

নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু।

মনে হল, আমাকে সে সেলাম করছে। যেন বলছে, আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হলনা নিজেকে।

লণ্ঠন হাতে এল কদমালি।

ঠেসে খানিকক্ষণ গালাগালি করল ছাদেমকে। নতুন বস্ত্রের এই

পরিণাম? আত্মহত্যাই যদি করবি, তবে একগাছা দড়ি জোগাড় করতে পারলিনে? ঠাট করে নতুন কাপড় গলায় জড়াতে গেলি? এরি জন্যে তোকে কাপড় এনে দিয়েছিলাম?

ভাবলুম, এ কি তার প্রতিশোধ, না, প্রতারণা?

লণ্ঠন নিয়ে কদমালিও খুঁজে এল তার কুঁড়ে ঘর। আনাচ-কানাচ। গলি-ঘুঁজি। ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের খসখসানি। ঝরা পাতার শব্দ।

শুকনো ও শূন্য ঘর। মাদুর পেতে কেউ শোয়নি, শিকে থেকে নামায়নি হাঁড়িকুঁড়ি। জল বা আগুনের রেখা পড়েনি কোথাও। শুধু ছাড়া-গরুটা ঘাস চিবুচ্ছে আর বাছুরটা ঘোরাঘুরি করছে।

একা লোকের পক্ষে এই বিতৃষ্ণাটা অবান্তর নয়?

'কে ছিল এই লোকটার?'

কেউ বলতে পারেনা।

যদি বা কেউ ছিল, গত দুর্ভিক্ষে সাবাড় হয়ে গেছে, কেউ-কেউ মন্তব্য করলে। ভাতের দুর্ভিক্ষে।

কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও যে লোক মরে এই দেখলুম প্রথম।

কিন্তু কাপড়ের বেলায় দুর্ভিক্ষ কোথায় ছাদেম ফকিরের? তাকে তো জোগাড় করে দিয়েছিলুম একখানা। তা কোমরে না রেখে গলায় জড়াল কেন? কোন দুঃখে?

শেষ পর্যন্ত দুঃখ না হয়ে রাগ হতে লাগল।

বললুম, 'থানায় খবর গেছে?'

'এতেলা নিয়ে গেছে দফাদার।'

'আর, কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও।'

সকালবেলাটা শহরের মধ্যে হাঁটি। রবিবার দেখে গেলুম নালতাকুড়ের পথে।

সেই যেখানে ছাদেম ফকিরের বাড়ি। সেই আম গাছ। স্পষ্ট দিনের আলোতে নিতে হবে তার অবস্থানের জ্যামিতিটা। আয়ত্তে আনতে হবে তার অনুভবের পরিমণ্ডল।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। বেশ মুক্ত কণ্ঠের কান্না। আর, আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের।

কে কাঁদছে? এগোলুম কুঁড়েঘরের দিকে।

'ছাদেম ফকিরের পরিবার আর তার পুতের বৌ। পুত মরেছে এবার বসন্তে।' কে একজন বললে সহানুভূতির স্বরে।

'কেন, কাঁদছে কেন?' যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, প্রশ্নটা এমনি খাপছাড়া শোনাল।

ছাদেম ফকির গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পুলিশের হাঙ্গামার পর লাশ এই নিয়ে গেছে কবরখোলায়।

কাল ছিল কোথায় এরা সমস্ত দিনে-রাতে? ছাদেম ফকিরের পরিবার আর পুতের বৌ? মরে গিয়েছিল নাকি? মুছে গিয়েছিল নাকি? লুকিয়ে ছিল নাকি জঙ্গলে?

পর্দানশিন হলেও শোকের প্রাবল্যে এখন আর সেই আবরু নেই। কিংবা, এখনই হয়তো আবরু আছে। লোকের সামনে করতে পারছে শোকের দুরন্ত দুঃসাহস।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, হেলে-পড়া চালের নিচে দাবার উপরে ছাদেমের পরিবার আর তার পুতের বৌ গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে জিগির দিয়ে কাঁদছে। যেন সদ্য-সদ্য ঘটেছে ঘটনাটা। কিংবা সদ্য-সদ্য কাঁদবার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। পেয়েছে আত্মঘোষণার স্বাধীনতা।

তাদের পরনে, সন্দেহ কি, আমারই দেয়া সেই লাল-পাড় ধুতির দুই ছিন্ন অংশ। ফালা দেবার আগে খুলে নিয়েছে ছাদেমের গলা থেকে, লাশখানায় চালান দেবার আগে। সেই কাপড়ে সসম্মান তিন অংশ বোধ হয় হতে পারত না। আর, আগেই শাশুড়িতে-বৌয়ে ভাগ করে দিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে?

ঘোড়া

গরু কুড়ে। চাষাও কুড়ে। তবু ফলন হল অজস্র।

কেন হল কে বলবে। দৈবব্যাঘাত ছিল না, তবু এই মেহনতে গত সন আট আনা ফসলও হয়নি। আকাশ ও মাটির একেক সময় কি-একটা অজানা বনিবনা হয়। ধান আসে অফুরান।

গত যুদ্ধে পাটের বাজার পড়েছিল। এবার ধানের।

ওবারকার বাজারের নাম ছিল বড় বাজার, এবারকার পাগলা বাজার।

ওবার টাকা নিয়েছিল লোকে পুঁটলিতে বেঁধে, গেঁজেয় বা থলেতে-খুতিতে। এবার ধামায় করে। কেউ-কেউ বা বলে, এক ডোঙা টাকা। নৌকার মাল-খোপে টাকা বোঝাই।

কাগজের টাকা। মাটির তলায় পুঁততে পারে না। উড়িয়ে দিতে হয় হাওয়ায়।

জবান খাঁ বললে, 'এবার করি কি ?'

এক বিবি ছিল আলেকজান। আরো দুটো বিয়ে করল, খোসজান আর তুষ্টু বিবি। মামলা বসাল কয়েক নম্বর।

'তার পর ?'

আরো জমি কিনতে চাইল। জমি তো মাটি নয়, বুকের মাংস, তাই সহজে কেউ ছাড়তে চায় না। তবু এর মধ্যে পাওয়া যায় হাভাতে চাষা, খোরাকির ধান যার ঘরে নেই, খাজনা যে টানতে পারে না, পেটের অভাবের জন্যে যে ভিটে-জমি কবালা করে।

তার পর ?

কোশ নৌকা হয়েছে একখানা। ডাবা হুকোর বদলে গড়গড়া। টিনের ঘর। মাটির হাঁড়িকুঁড়ির বদলে এলুমিনিয়মের বাসন। ডেকচি-ডাবোর।

তবু মন ওঠে না।

টাকা আছে, তবুও শান্তি নেই। পেট ভরেছে। কিন্তু বুক ভরে না।

মান চাই নাম চাই।

আসল দাম হচ্ছে নামে। নাম ছাড়া টাকা হচ্ছে, গরু আছে তো হাল বয় না। আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

খাদেম বলে, 'আছে টাকা না হয় নাম, তাকে দুনিয়ায় কেন পাঠালাম!'

'গাঁয়ের ইস্কুলে কিছু টাকা দাও।'

তার বাড়ি থেকে ইস্কুল পাঁচপো পথ। সেখানে চাঁদা দেবে না হাতি! ইস্কুল তার বাড়ির খোলায় এসে বসত, দিত কিছু। যদি 'মেম্বর' হতে পারে, খসাতে পারে না-হয় দু'-পাঁচশো। শুধু-শুধু খয়রাতি করতে পারে না।

'টিউবওয়েলটা খারাপ হয়ে গেছে, ওটা সারিয়ে দাও।'

আমার বাড়ির কাছে টিউবওয়েল হত, সারিয়ে দিতুম। লোকে বলত, কোথাকার টিপকল? না, জবানখাঁর বাড়ির বগলে। এখন ওটা 'পিসিডিনের' বাড়ির নগিজে। সে দিক টাকা।

'পাইকহাটির সাঁকোটা ভেঙে গেছে। টাকা দিন, ওখানে একটা পাকা পুল তুলি।'

'অপারগ, স্যার। আইন করে পুলের নাম 'জবান খাঁর পুল' করে দিতে পারেন? যেমন সব উজবুক চাষা, বলতে বলবে সেই পাইক-হাটির পুল। নাম লিখে দিয়ে লাভ কি? পড়তে পারে কেউ?'

তবে করবে কি সে টাকা দিয়ে ?

গরু কেন'। অকেজো গরুর বদলে পশ্চিমে ষাঁড়। বসে-খাওয়া গরু আর ঝোলাপেটা ষাঁড়ে দেশ ছেয়ে গেছে। এবার মজবুত গরু তৈরি কর। খালি ধানদুব্বোয় পূজো না করে ভুট্টা-জোয়ার, চুনিভূষি, খই-মটরে পূজো কর। গিনি আর নেপিয়ার ঘাসের চাষ লাগাও। পার তো, তিসি আর মাসকলাই।

খাদেম মুচকি-মুচকি হাসে। বলে, গরু নয় হে, গরু নয়। ঘোড়া।

জবান খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

সন্দেহ কি, যারা মানী লোক, তাদেরই ঘরের মুখোরে ঘোড়া বাঁধা। খোরসেদ হাওলাদার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তার ঘোড়া আছে। যুবরাজ খাঁ পাশ-গ্রামের চৌকিদার, তার আছে ঘোড়া। গগনআলি ইস্কুল-কমিটির মেম্বর, তিনখানা গাঁ থুয়ে তার বাড়ি, তার ঘোড়া আছে। অবস্থা ফিরলেই লোকে ঘোড়া রাখে।

জবান খাঁ এখন জোরমন্ত লোক। ঘোড়া না হলে আর মানায় না তাকে। ইষ্টকুটুম্বের কাছে মান থাকে না। প্রজাপুঞ্জ তেমনি ঘাড় ছোট করেই কথা বলে।

তা ছাড়া, খোরসেদের সঙ্গে তার এওজ জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া। যুবরাজ খাঁর সঙ্গে জামাত নিয়ে তর্ক। গগন আলির সঙ্গে ভোট নিয়ে লাগালাগি।

না, ঘোড়া চাই।

এত দিন দুর্ব্বল ছিল বলেই গরু-মোষের দিকে তাকিয়েছে, এবার ঘোড়ার দিকে নজর পড়ল জবানখাঁর। গরিব বলেই ভোটে জেতেনি,

মামলায় জেতেনি। পারেনি ইউনিয়ন বোর্ডে ঢুকতে, পারেনি স্কুল-কমিটিতে, সালিশী বোর্ডে। জনে-জনে টাকা দেবার মত তার মুরোদ ছিল না। এবার এক মুঠে ফেলে দিতে পারে কয়েক শো।

নতুন আরেকটা কমিটি হয়েছে। ফুডকমিটি।

জবান খাঁ এখন ফুডকমিটির মেম্বর।

আর, মেম্বর যখন সে হয়েছে তখন তার ঘোড়া না হওয়া মানে চাপরাশির চাপ না হওয়া।

কিন্তু এ ঘোড়া চড়বার জন্যে নয়, চরে বেড়াবার জন্যে। বাড়ি ফিরিয়ে এনে আড়গড়ায় বেঁধে রাখবার জন্যে। এ ঘোড়া হচ্ছে সম্ভ্রমের সাইনবোর্ড। লোকে বলবে, দরজায় ঘোড়া বাঁধা।

মাঝে-মধ্যে জমিদারের কাছারির মাঠে থৌল বসে। তখন ঘোড়-দৌড় হয়। খোরসেদ হাওলাদার, যুবরাজ খাঁ আর গগন আলির ঘোড়ার সঙ্গে জবান খাঁর ঘোড়া দৌড়ুবে একদিন।

জবান খাঁ আর চিটে-গুড়-মাখা দা-কাটা তামাক খায় না। সে এখন চালানী তামাক খায়। ফরসিতে টান মারে আর সেই শুভদিনের স্বপ্ন দেখে।

জবান খাঁ হরিছত্রের মেলায় যাবে। সেখানে হাতি ওঠে, ঘোড়া ওঠে, উট ওঠে।

খাদেম সিকদার টন্নি মানুষ। যেখানে দুটো পয়সা মুনফা আছে সেখানেই নাক ঢোকায়। কার সঙ্গে কার ঝগড়া বাধতে পারে শুধু তারই সুলুক-সন্ধান দেখে বেড়ায়। এর হাতে দেয় সিঁদকাঠি, ওর হাতে দেয় ল্যাজা। ঝগড়াটাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে নিয়ে যায় মামলাতে তার পরে চারদিক থেকে পয়সা লোটে।

খাদেম বলে, 'খোট্টা ঘোড়াতে সুবিধে হবে না, হাল-চাল বুঝবে

পারবে না আমাদের। ঢাকার ঘোড়া নিয়ে ব্যাপারীরা এসে পড়বে শিগগির।'

এ সময় আসে বেপারীরা। নানান রকম বেপারী। আসে টিন। মাটির হাঁড়ি-কলসী। কাঁচের চুড়ি, খেলনা-পুতুল। আসে সার্কাস।

ঢাকার ঘোড়া মানে? গাড়ির ঘোড়া? পংখীরাজ?

'আরে না না, রেসের ঘোড়া। প্রিন্স অব আগ্রা।'

আটশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনল জবান খাঁ।

দেশময় সাড়া পড়ে গেল। ফুডকমিটির মেম্বর সাহেব ঘোড়া কিনেছে! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ঢাকার রেসে বাজি মেরেছে কয়েক বার। ছেলেবুড়ো নাছোড়ের মত ঘোড়ার পিছু নেয়। ঘোড়া চললে চলে, থামলে দাঁড়ায়। মেয়েরা মফস্বলে উঁকিঝুঁকি মারে।

জবান খাঁর বুক সাত হাত হয়ে ওঠে।

কি তেজী জোয়ান ঘোড়া! কেমন ঢেউ-খেলানো কেশর! ঘাড়ের কেমন জবরদস্ত ঝাঁকুনি!

জবান খাঁর ঘোড়া বলে যেন মনেই হয় না।

'এর একটা নাম রাখতে হয়—'

'না, না, নাম কিসের?' খাদেম বিজ্ঞের মত বলে, 'ওর নাম হলে তো ওরই নাম হবে। আপনাকে তখন চিনবে কে? যখন ও রেস জিতবে, তখন লোকে শুধোবে, কার ঘোড়া? সবাই বলবে, ফুড-কমিটির মেম্বর সাহেবের ঘোড়া।'

ঠিক, ঠিক। ঘোড়ার নাম নয়, নিজের নাম। মাজিস্টর সাহেবের

লক্ষ। এস্‌ডিও সাহেবের আর্দালি। ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া।

কে ওই যায় মাঠ দিয়ে? গলায় লাল রুমাল বাঁধা, কপালে সিতাপাটি, কে যায় ওই রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে? বা, চেন না ওকে? ও যে ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া। মেম্বট সাহেবকে চেন না? আরে, আমাদের জবান খাঁ। হাচন আলির বেটা।

আজ শুধু খাঁ। কালকেই খাঁ সাহেব।

ঘোড়া দেখা শেষ হলে সবাই পরে জবান খাঁকে দেখে যায়। গগন আলিদের মত সে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া কেনেনি। সে কিনেছে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া।

বাছাই-করা সোয়ার আনতে হয়েছে শহর থেকে। নইলে ওকে সামলাবে কে? গগন আলিদের ছাড়া ঘোড়া, আবান্ধা ঘোড়া, মাঠে-মাঠে গরু-ছাগলের মত চরে বেড়ায়। ঘাস খায়। জবান খাঁর ঘোড়ার সব সময় সোয়ার থাকে। মুখে দড়ি দিয়ে সেই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার মান কত!

কখনো-কখনো ঘোড়া কারুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। উৎসব লেগে যায়।

মেয়েরা কুলোয় করে চাল খেতে দেয়। বালতিতে করে এখো গুড়ের সরবৎ। যার বাড়ি ঢোকে, সেই কৃতার্থ মনে করে। পীর-ফকির হলেও এমন হয় না। তদন্তের দারোগার চেয়েও সম্মানী অতিথি।

যদি কেউ একটু ছুঁতে পারে আলগোছে! যদি গায়ে লাগে একটু লেজের হাওয়া!

কার ঘোড়া? ফুডকমিটির মেম্বর সাহেবের ঘোড়া। কার দোহাই? না, মহারাণীর দোহাই।

কিন্তু থৌল আর বসে না কোথাও।

জমিদাররা সব নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আর সেই দাব নেই, বাবও উঠে গেছে—পরবী আর দস্তুর, বাটা আর মেহমানি। পুন্নের সময়ও আর সেই দরবার-কারবার বসে না। মেলা-মজলিস এখন সব মিইয়ে গেছে।

তবু ঘোড়া আছে জবান খাঁর।

ছন্নছাড়ার মত মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস খায়। ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ে।

সোয়ার যে ছিল, মনশুর, সে এখন চাষ-আবাদ দেখাশোনা করে, ভুঁই ভাঙে, বীজপাতার চাতর দেয়। কখনো-কখনো বা পেয়াদা-মির্ধার কাজ করে। তদবির-তদারকের মধ্যে মাঝে-মাঝে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঢিমে কদমে হাওয়া খেতে বেরোয়। জিনের বদলে পিঠের উপর একটা তুমড়ানো বালিশ আর লাগামের বদলে দড়ি।

কেউ-কেউ বলে, দৌড় করাও।

মনশুর বলে, এখন কি। যখন থৌল বসবে, তখন! বেফয়দা ছুটিয়ে লাভ নেই।

সোয়ার ঘোড়ায় চড়ে, তাই উজ্জ্বল চোখে দেখে জবান খাঁ। বুকের রক্ত মুখের উপর চলকে ওঠে।

তারপর যেদিন ও ছুটবে, ফার্স্ট হবে, সেদিন ওর খুরের বাজনা বাজবে যেন বুকের পাঁজরায়!

কিন্তু কবে ও ছুটবে ? কবে হবে ওর নিমন্ত্রণ ?

নোনা হাওয়ায় বাত ধরেছে বোধ হয়। খালি চাল খায়, ধান খায়, ঘাস খায়। প্রায় গরুর মত ব্যবহার করে। গেঁতো হয়ে পড়ছে দিন-কে-দিন। গাধা বোটের লস্করের মত। যখন-তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমোয়।

শরীরে যেন সে তেজ নেই, জেল্লা নেই! কেবল খায়। খেতে পেলেই খায়, যা পাই তাই! ক্ষেত-টেত সব তছরুপ করে দিচ্ছে। খেসারি বুনেছিল আউস ধানের সঙ্গে, ফসল পাকবার আগেই সব খেয়ে নিয়েছে। আশ্বিন মাসে খেয়ে নিয়েছে জোয়ার। অঘ্রানে মাসকলাই। মাঘে অড়হর। শুধু কি তাই ? করলা, কাঁকরোল, ঝিঙে, সিম, নটে, পুঁই পর্যন্ত সাবাড় করে দিয়েছে। যেন এসেছে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে।

হিসেব জানে না জবান খাঁ। খাতা-পত্র রাখে না। তবু, মাঝে-মাঝে হাতড়ে সংখ্যা গোনে। আঁৎকে ওঠে। সে কি এবার ফতুর হয়ে যাবে নাকি ?

তবু, মানের জিনিসের উপর সে মান করতে পারে না।

শুধু কি তাই ? চাঁট ছুড়ে আলেকজানের কোঁক ভেঙে দিয়েছে। খোসজানের দাবনা। তুষ্টু বিবির কোলের বাচ্ছাটাকে চেপটে একেবারে চাটাই করে দিয়েছে।

তবু জবান খাঁ সোরসরাবৎ করেনা। এমন একটা ভাব করে থাকে, যেন বড়লোক হলেই এমনি খেসারৎ দিতে হয়। শুধু সোয়ারকে আড়ালে ডেকে এনে ধমকে দেয়। শাসিয়ে বলে, দরমাহা থেকে জরিমানা যাবে।

সোয়ার ঘোড়াকে নিরালা মাঠে নিয়ে গিয়ে চাবুকের অভাবে চেলা-কাঠ দিয়ে পেটায়।

বাবু ঘোড়া তবু ছোটে না। পাছা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যা একটু প্রতিবাদের মন্তব্য করে।

যুবরাজ খাঁ তার ঘোড়া বেচে ফেলেছে বড়-শহরের গাড়োয়ানের কাছে।

এখুনি এত অধঃপাতে যায়নি জবান খাঁ। যুবরাজের ঘোড়া প্রায় পাটখড়ি বনে যাচ্ছিল, ঘোড়া না গাধা চেনা যাচ্ছিল না। জবান খাঁর ঘোড়া দিব্যি নাদাপেটা, অনেক সম্ভ্রান্ত। এখনো বেচে-কিনে সব খেয়ে ফেলার মত তার অবস্থা হয়নি। তা ছাড়া খোরসেদের ঘোড়া আছে, গগন আলির ঘোড়া আছে।

খোসজান আর তুষ্টু বিবিকে সে তালাক দিল, কিন্তু ঘোড়া ছাড়তে পারল না। খোসজান আর তুষ্টু বিবির সঙ্গে গেল তাদের হাঁটানে ছেলে-মেয়ে, কিন্তু থেকে গেল সোয়ার।

এমন সময় ঢোলনছব হল গ্রামে, শহরে একজিবিশন হবে। আর সেই একজিবিশনে হবে ঘোড়দৌড়।

পোদ্দার-সাহা বা ভুঁইয়া-মোল্লাদের থৌল নয়, শহরের একজিবিশন। কে কত লম্বা আখ করেছে, কত বড় কুমড়ো বা লাউ, মুলো বা ওল, তার প্রদর্শনী। রেশমী চুল আর পাতলা চাম, বড় পালান আর আঙ্গলে বাঁট দেখে গরু কেনার নির্দেশ। গরুর দুটো বাঁটের দুধ টেনে নিয়ে আর-দুটো বাঁটের দুধ যে বাছুরের জন্যে রেখে দিতে হবে তার টিপ্পনি। করিম কেমন পড়ে ডিপটি হচ্ছে আর মজিদ কেমন না পড়ে জমি চষছে তার লটকানো ছবি। মুরগির যাতে 'রানিক্ষেত' না হয় তার ইস্তিহার।

আর দুর্ভিক্ষের পর সারি-সারি বেসুমার খাবারের দোকান। তেলেভাজা থেকে সুরু করে মাংস-পোলাও। সোডা-লেমনেড।

তা না হলে লোকে আসবে কেন ভিড় করে? ফুর্তির জিনিস না রাখলে জনশিক্ষা হবে কেমন করে?

তড়ে-নৌকায় লোক আসতে লাগল দলে-দলে। দেখবে কোন সাহেবের ঘোড়া জেতে। পান্তা-পোড়ার বেশি খায় না কোনোদিন, এবার খাবে কিছু ঝাল-ঝাল মিষ্টি-মিষ্টি সুগন্ধি রান্না। তারপর রাত্রে জারি শুনবে, গাজি ও কালুর গান, কিংবা এজিদবধের পালা।

এতদিনে দিন এল জবান খাঁর। দিন এল আরো অনেক ঘোড়াওলার।

এক লপ্তে ফাঁকা মাঠ পাওয়া গেছে প্রকাণ্ড। শুধু মানুষের মাথা। শুধু ডাক-চীৎকার। শুধু উত্তাল ভিড়ের মধ্যে একে-ওকে ডেকে বেড়ানো।

আবাদে গরু উদোম হয়, এখানে মানুষ।

গলায় রুমাল-বাঁধা ঘোড়ারা দাঁড়িয়েছে দড়ি-সই হয়ে। পিঠের উপর কোল-বালিশ চেপে সোয়ার ব'সে। হাতে দড়ির লাগাম। বাঁশি দিলেই ছুটবে—ছুটবে তুফানের মত।

ঘোড়া ছোটে, সঙ্গে-সঙ্গে লোকও ছোটে।

সোয়ারদের একেকজন ঠ্যাঙাড়ে থাকে, ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ঘোড়ার পাছায় ঠ্যাঙার বাড়ি মারে। তাতেই ঘোড়াকে প্রেরণা দেয়া হয়, তার ছোটায় চাড় আসে। বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ পাছার উপর ঠ্যাঙার বাড়ি। ঢিমিয়ে-পড়া ঘোড়া আবার টগবগিয়ে ওঠে।

জবান খাঁও অনেকটা মাঠ ছুটে এসেছিল, কিন্তু ভিড়ের চাপে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

শুনল, এ অঞ্চলের কেউ নয়, কোন এক রহিমদ্দি পালোয়ানের সাজোয়ান ঘোড়া ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ি সুপখালি। অনেক দূর।

আর জবান খাঁর? জিগগেস করল একটা উটকো লোককে।

বললে, সোয়ারকে মাঝ-মাঠে ফেলে দিয়ে ঢুকেছে পাশের কলাইয়ের ক্ষেতে। ঠ্যাঙাড়ের বাড়ি ঘোড়ায় পাছায় না পড়ে পড়েছে প্রায় মনশুরের পিঠে, তাইতেই এই কেলেংকারি। কিন্তু জবান খাঁর জামাতের লোকেরা তা মানতে চায় না। বলে, বড় বেশি চাল খায় ও। তাই অমন ভেতো হয়ে পড়েছে। ওকে চানা খাওয়াও। বজরা-জোয়ার খাওয়াও।

ঘোড়াকে এনে আবার দোরগোড়ায় বাঁধা হল। গলায় সেই শুকনো রুমাল, মেডেল ঝুলছে না তার সঙ্গে, তবু কিছু মনে করেনি জবান খাঁ। দেখা যাবে পরের বার। একবারে একজনের বেশি তো ফার্স্ট হবে না। খোরসেদ-গগন আলি তো পায়নি।

ঘোড়াকে আর মাঠে ছেড়ে দেওয়া নয়। পোষ্টাই খাওয়াতে হবে। ছন্নছাড়ার মত আর ঘাস-পাতা নয়।

ফুডকমিটির হাতে কয়েক শো বস্তা বজরা এসেছে। লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর গুদামে বসে পচছিল অনেক দিন। সেগুলি এবার সাফ করে দেয়া দরকার। পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে নয়, টেণ্ডার নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে। অর্ডার হয়েছে, পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করতে পার, কিন্তু, খবরদার, মানুষের খাদ্যরূপে নয়।

কত মানুষ পশুরও অধম হয়ে মরে গেছে তার লেখাজোখা নেই।

জবান খাঁ কিনলে কয়েক বস্তা। মজুত করলে।

বালতি বোঝাই করে খেতে দিল ঘোড়াকে। কতদিন মাঠের টাটকা শাক-সবজি খেতে পায়নি, ঘোড়া অশ্বগ্রাসে খেতে লাগল।

কিন্তু খাবার পর, নাকের মধ্য দিয়ে কতগুলি শব্দ করে ও কতক্ষণ ঘন-ঘন লেজ নেড়ে, মশা তাড়িয়ে, কি হল তার কে বলবে। পাগলের মত হয়ে গেল। হন্যের মত। দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগল বেমক্কা। মনশুর তাকে ধরতে গেল, কাঁধের উপর কামড়ে দিলে। জবান খাঁকে দেখতে পেয়ে মারলে দু'পায়ে চাঁট ছুঁড়ে। গাছের সঙ্গে ঠোকর লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। কারু সাহস হল না এগিয়ে যায়। খানা-খোদল পেরিয়ে ছুটছে, ফিরছে, আবার কান্নিক খাচ্ছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল বেহুঁসের মত।

সবাই বললে, শূল হয়েছে। অশ্বশূল।

তড়পে-তড়পেই মরবে এবার।

টন্নি বললে গলা নামিয়ে, 'নিশ্চয়ই কেউ বিষ খাইয়েছে। নিশ্চয়ই এ মনশুরের কাণ্ড। মনশুর খোরসেদের চাচাত বোনাই, গগন আলির ফুফাত ভাই। যাই আমি শহর থেকে পশু-ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। তার রিপোর্ট পেলেই ড্যামেজের মামলা ঠুকে দিতে হবে এক নম্বর—'

পঞ্চাশ টাকা কবুল করে পশু-ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়া শেষ পগার পেরিয়ে গেছে।

সবাই বললে, 'নদীতে ভাসিয়ে দাও শালাকে।'

জবান খাঁ বললে, 'না, মাটি দেব। ওকে আমি অসম্মানী হতে দেব না।'

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে গেল সে কবরখানায়। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে এল। অন্ধকারে শুনল একটা গরু ডাকছে বাড়ির মধ্যে।

রাঢ়

প্রথমটায় মানদাকে পছন্দ করা হয়নি। কিন্তু তার নিজের থেকে এই প্রার্থনাটা ভারি পছন্দ হল।

'আমাকেও নিয়ে চলুন।' লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারলনা মানদা। ঠিকেদার আপাদমস্তক দেখল একবার তাকে। কদাকার সন্দেহ নেই। খেতে-মাখতে না পেয়ে এমন কদাকার হয়েছে, কে না জানে। রূপ না থাক, চামড়ায় তাজা আনাজের চেকনাই আছে। মুখে গেঁয়ো-গেঁয়ো মোলায়েম ভাব আছে একটা। বাজে-মার্কা শস্তা রুজ-পাউডারের মধ্যে কারু চোখে লেগেও যেতে পারে বা।

বয়েস বেশি নয়। একটি ছেলে হয়েছিল দু'বছর আগে। চুকে-বুকে গেছে। এখন সে একেবারে খালি-হাত, খালি-কোল।

'তোমার স্বামীর মত আছে?'

মিছে এ প্রশ্ন করা। এ-কথা ঠিকেদার নিজেও জানে। যখন ক্ষুধা আর রোগ লকলকে জিভ মেলে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে তখন সমস্ত ভিত গিয়েছে নড়ে, পিলেন গিয়েছে খসে, ঘুণ ধরেছে কপাটে-কড়িকাঠে। আঁট দিয়ে আর গেরো বাঁধা নেই। তছনছ, অলছতলছ।

'পয়সা পেলে অমত করবেনা।' বললে মানদা পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁটতে-খুঁটতে।

দাম ঠিক হল দশ টাকা। মানদার মনে হল যেন আঁচলে করে মাঠভরা ধান বেঁধে নিয়ে চলেছে।

কান্তরাম শুকনো হোগলার উপর শুয়ে ধুঁকছে জ্বরের ঘোরে। জিরজির করছে হাত-পা, বুক-পিঠ। পেটটা অথচ ঢাক। পেট-জোড়া পিলে। গলার নিচে বুক যেন আর দেখা যায়না।

টাকাটা স্বামীর হাতে দিয়ে মানদা বললে, 'এ টাকাটা নিয়ে তুমি কৈজুরির হাঁসপাতালে চলে যাও। সরকারী ডাক্তার দেখাও।'

'তুই কিছু রাখবিনে ?'

'না, আমার এখন আর কী লাগবে?' চোখ নামাল মানদা।

'খেতে-পরতে দেবে তো ?'

'না দিলে চলবে কেন ?'

'আবার ফিরে আসবি ?' কান্তরাম হাত বাড়িয়ে ছুঁলো একটু মানদাকে।

'এক মাস ধরে মেলা। মেলা ভেঙে গেলেই চলে আসব।'

'তুই আসবিনা। কিন্তু আমি থাকব তোর পথ চেয়ে।'

'আমি ফিরে এলে আবার তুমি আমাকে নেবে ? ছোঁবে আমাকে ?' মানদা স্বামীর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'আমি জানিনা তুই কেন যাচ্ছিস ? মরণ তোকে নিতে পারে, আমি পারবোনা ? আমি কি মরণের চেয়ে অধম ?'

'কিন্তু তুমি হাঁসপাতালে যেও। ওষুধ খেও, দুধ খেও—'

দল-বিদলের মেয়ে নিয়ে নৌকো চলেছে ডুমুরতলার ঘাটে। সেখানে কার্ত্তিক পূজার দিন থেকে মেলা বসবে।

ঠিকেদার মেয়েগুলোকে দালালের আস্তানায় এনে হাজির করলে। দরমার বেড়া, তাল-নারকোল পাতার ছাউনি। এটা বাজারের মধ্যে। মেলা বসবে দূরে, যেখানে হাট বসে তার পাশে। খদ্দের বুঝে রপ্তানি হবে। নইলে শুধু-শুধু ইজারাদারকে তোলা দিতে যাবে কেন ?

কতগুলি একেবারে রোতো জিনিস এসেছে। শুধু সৎ বা নীরোগ এই সার্টিফিকেটে উতরোতে পারবে আছে এমন কতগুলি। তার মধ্যে মানদা একজন।

তা ছাড়া এ বছরে খদ্দের-পাতি বড় কম। বড় নিরানন্দ বছর। যে-কেউই কয়টা পয়সা পায় কুড়িয়ে, চাল-ডাল কাপড়-গামছা কেনে।

স্ফূর্তি করবার মত কারু মন নেই, স্বাস্থ্য নেই। নেশার সব জিনিসই গিয়েছে নিঝুম হয়ে। শুধু যারা ধান বেচে কাঁচা পয়সা পেয়েছে, কাগজের টাকা বলেই মাটিতে না পুঁতে এদিক-ওদিক উড়িয়ে দিচ্ছে কয়েকখানা। তা-ও এবার অনেক কম। বড়-জোর দশ-বারো নম্বর। বাজার এবার বড় মন্দা।

তাই আর ডাক পড়েনা মানদার। তার দু'নম্বর উপরে খতেজান বিবি পর্যন্ত এক দিন ডাক এসে পৌচেছিলো, সে ঐ এক দিনই। খতেজান বিবি পর্যন্ত ঘাগরা পরল, কিন্তু মানদার পরনে সেই শত-গাঁট ছেঁড়া টেনি। দু'বেলা খেতে পায় সে বটে, কিন্তু সাজতে পায়না।

আয়নাতে একেক দিন নিজেকে দেখে মানদা। আগের থেকে অনেক ভরা-ভরা হয়েছে। যেন সাহস পায়। প্রতীক্ষা করে বসে থাকবার মত শক্তি।

আসবে একদিন জনবন্যা। সেদিন সেও বাদ পড়বেনা। সেও সাজবে, হাতে কেমিকেলের চুড়ি পরবে, মুখে রঙ ঘসবে। পাবে করকরে টাকা, রঙিন শাড়ি-জামা, পাবে মনোনয়নের মর্যাদা।

লোক নেই, লোক নেই। বড় খারাপ দিন।

সে বসে-বসে তার স্বামীর কথা ভাবে, তার জীবনে একমাত্র পুরুষের কথা। হয়তো ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেছে এত দিনে। হয়তো ফিরে পেয়েছে তার নৌকো। মাছ ধরছে আবার। হয়তো বিয়ে করেছে নতুন। তা ছাড়া আবার কি! তাকে কি আর ছোঁবে নাকি? চালানী নৌকোয় এসেছে অথচ ছোঁয়া বাঁচিয়ে আছে, বিশ্বাস করবে নাকি এমন অসম্ভব খবর?

বড় অপমান লাগে মানদার। শুধু দু'বেলা মাগনা খেতে পায় বলেই চলে যেতে পা ওঠেনা।

একেক সময় আশ্রয় নিতে চায় তার নিষ্কলুষ নিষ্ঠার নোঙরে, কিন্তু বলতে কি, সান্ত্বনা পায়না। একেক সময় সত্যিই বড় নিঃস্ব মনে হয়।

তারপর একদিন ভেঙে যায় মেলা। গুটিয়ে ফেলতে হয় তাঁবুকানাত কেউ-কেউ দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে এরি মধ্যে। তারা উঠে আসে বাজারে পাকাপাকি ভাবে। কেউ-কেউ বা গাঁয়ের মধ্যে খালের ধারে গিয়ে ঘর নেয়। শুধু একা মানদাই বাড়ি ফিরে চলে।

'কোথাও আর ঠাঁই নেই, এই খেনেই থেকে যা বলছি।' কেউ-কেউ তাকে উপদেশ দেয়, 'সকলেই কেউ দালালের চোখ দিয়ে দেখেনা, লালচোখও আছে দুনিয়ায়।'

কিন্তু, না, কান দেয়না মানদা। যখন সে বেঁচে গেছে, তখন সে তার স্বামীর কাছেই ফিরে যাবে। কান্তরাম রয়েছে তার প্রতীক্ষা করে।

যদি দূরে সরিয়ে রাখে থাকবে না হয় দূরে সরে। যেমন এতদিন ছিল। থাকবে প্রতীক্ষা করে। যদি কোনদিন ডাক পড়ে। যদি কোনদিন পবিত্রতার জয় হয়।

তিনটে খেয়া ডিঙিয়ে অনেক হাঁটা পথ ভেঙে ভর দুপুরে মানদা পৌঁছুলো তার গ্রামে, পুঁইজালায়। সেই যে-কে-সে অবস্থায়। সেই কানি পরনে, আঁচল এবার গ্রন্থিহীন।

কিন্তু একি তার গ্রামের চেহারা। এ যে শুধু জঙ্গল আর আঘাসা। চেনা যায়না চারপাশ। দিনের বেলায় শেয়ালের পাল। নিচু-হয়ে-ওড়া শকুনের ভিড়।

দু' একজনের সঙ্গে দেখা হল। দিনের বেলায়ও তাদের ভূত মনে হয়। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, এই সেই পুঁইজালা। একে ম্যালেরিয়া, তায় লেগেছে কলেরা। উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এই তো তাদের বাড়ি। চিনতে পারতনা, যদি না চিনতে পারত সেই পৃথ্বীরাজ গাছটা। সেই ফণীমনসার ঝাড়। রাতে শাদা ফুল-ফোটান সেই করবীর চারা।

তাদেরই তো সেই ঘর। দোচালার এক চাল কোথায় উড়ে চলে গিয়েছে, আর এক চাল রয়েছে মুখ থুবড়ে। হাঁড়িকুঁড়ি সব ছত্রখান। অনাবৃত ভিতের উপর ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতার দীর্ঘশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্ব্বত্র মৃত্যুর নৃত্যচিহ্ন। যে হোগলার চাটাইয়ের উপর কান্তরাম ছিল শুয়ে তার অবশেষ এখনো পড়ে আছে পোতার উপর। দাঁত দিয়ে ছেঁড়া নখ দিয়ে আঁচড়ানো সেই হোগলার টুকরো।

কাকে ডাকবে মানদা? কার কাছে নেবে কৈফিয়ৎ?

তবু একবার মনে হল, হয়তো শহরে চলে গিয়েছে কান্তরাম। ভালো হয়ে, আগের মত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে। হয়তো বা নৌকো পেয়েছে ফিরে, বেঁউতি জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নদীতে। মড়কের তাড়ায় হয়তো গাঁ বদলেছে। জন দিচ্ছে হয়তো। লেগেছে দাওয়ালির কাজে।

না, যায়নি কোথাও। ওখানেই আছে, শুয়ে আছে। শুয়ে আছে ঐ গাব গাছটার নিচে, শেয়ালকাঁটার ঝোপের আড়ালে। শুয়ে আছে শাদা হয়ে। কঙ্কাল হয়ে।

বলেছিল, প্রতীক্ষা করে থাকবে। কথার খেলাপ করেনি। মাস-মজ্জা চলে গেলেও হাড় নিয়ে বসে আছে। কে নেবে তার সেই হাড়?

কঙ্কালটাকে কোলে নিয়ে বসে পড়ল মানদা। আশ্চর্য্য, কঙ্কাল দেখেই সে চিনতে পেরেছে কান্তরামকে। তার সমস্ত কোটরে আর গহ্বরে ক্ষুধার শূন্যতা।

কারা আসছে এদিকে। সাহেব-সুবোর মতো। কি খোঁজাখুজি

করছে। পিছনে একটা কুলির পিঠে বস্তা। কি সব নড়ছে-চড়ছে তার মধ্যে, খট্ খট্ আওয়াজ করছে।

'এই কঙ্কালটা কার?'

অম্লান মুখে বললে মানদা, 'আমার স্বামীর।'

'খাসা! পুরো কঙ্কাল। আর গড়ন দেখেছ হাড়ের!' সঙ্গীটি বললে ফিসফিসিয়ে।

ইদানি মাংসই ছিলনা, ছিলনা রক্ত। হাড়ের বনেদ পাকা থাকলেও ছিলনা ছাদ-দেওয়াল।

'এটা বেচবে আমাদের কাছে?'

এমন কেলেঙ্কারির কথা শুনেছে নাকি কেউ?

হ্যাঁ, আমরা কঙ্কালের ব্যবসা করি। হাড়পাঁজরা চালান দিই। দাম দিয়ে কিনি। জ্যান্ত গোটা মানুষের দাম না থাকলেও তার কঙ্কালের দাম আছে।

'কী হবে এ দিয়ে?'

জগৎসংসারের মহত্তম উপকার হবে। একজনের মৃত্যু দিয়ে আর একজনের চিকিৎসা হবে। কঙ্কালের সাহায্যে ডাক্তারি শিখবে ছেলেরা।

'বলো, কত দাম?'

মানদা তার কী জানে? মরে যাবার পরেই যে দাম এ কখনো শুনেছিল আগে? দু'জনে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। বললে, 'এই নাও কুড়ি টাকা।'

আঁচলে গিট দিল মানদা। চলল আবার ফিরে, সেই ডুমুরতলায়। জয়দুর্গা বলে দিয়েছিল পাশের ঘরটা রেখে দেবে তার জন্যে। বলে দিয়েছিল, সংসারে সকল চোখই দালালের চোখ নয়, আছে অনেক লাল চোখ।

মানদা ফিরে চলল বাজারে। আরেক কঙ্কালের হাতছানিতে।

চিতা

রাস্তার ধারে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কে-একটা ছেলে। নয়-দশ বছর বয়েস।

শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে মনে করা যায় না।

মরে আছে।

লক্ষ্য করলেই মুস্কিল। দাঁড়াতে হয়, খোঁজ নিতে হয়, মড়া সরাবার ঝক্কি নিতে হয়। অন্তত একটু শোকার্ত ভঙ্গি করতে হয়। আর শোকার্ত ভঙ্গি করতে গেলেই তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না।

তাই সকাল থেকে পড়ে থাকলেও ভিড় হতে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি। আর, যারা ভিড় করেছে বেশির ভাগই তারা এমনি পড়ে থাকবার মরে থাকবার মুখে।

জায়গাটা ভদ্র পাড়ার এলেকায়। আদালত-ডাক্তারখানা সব এক ডাকের পথ। ঠেকনা-দেয়া খোড়ো চালের ঘরের সামনে কটা উকিলের সেরেস্তা।

ছেলেটা একেবারে নির্জনে এসে মরেনি। আর সেটাই তার নির্লজ্জতা। কাছারির বেলা বাড়ছে দেখেও ভিড় ঠেলে উঁকি মারতে হয় একটু, মায়া করতে হয়, রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত একটা অভিশাপ চেপে রাখতে হয় বুকের মধ্যে। এ এক অকারণ অস্বস্তি। ভাত খেতে-খেতে হঠাৎ কাঁকর চিবোনো।

কেউ বলছে, কাহারদের ছেলে। কেউবা বলছে, মুচি, কেউ বা, কাপালি।

কিন্তু, সৎকারের ব্যবস্থা তো করতে হয়। কেউ বললে, মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাদের কারু দেখা নেই।

এ তো আর মরা বেরাল নয় যে ডোম এসে এক দরজা থেকে তুলে নিয়ে আরেক দরজায় ফেলে রাখবে। একে একেবারে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে নদীর ধাপায়, শ্মশানে।

অভ্যাসবশে সন্তোষ বেরিয়ে এসেছে। পরনে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ, গায়ে খদ্দরের ছিন্নাবশেষ। যেন এটুকুই তার আভিজাত্য। শরীরে অনেক জেল-খাটার দাগ, ক্লান্তির ম্লানিমা। চোখে নিরাশ্রয়ের চাউনি।

তবু, অভ্যাসবশে, কিছু একটা না করলে নয়। চিরকেলে সেই চেষ্টার চাঞ্চল্য।

'একটা তোমরা খাটুলি জোগাড় করতে পারলে না? কাঁধ দেবার লোক নেই তোমাদের মধ্যে? রোদ্দুরে পুড়ে মরবে ছেলেটা?'

কে কার দিকে তাকায়! বেশির ভাগই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া। মরা পেটে টিং,টিং করে ঘুরে,বেড়াচ্ছে। কেউ বা পেটে দড়ি দিয়ে পড়ে আছে এক পাশে। কেউ বা বসে যাচ্ছে একটু—তার মানেই, বেড়ে বসেছে!

মরা ছেলেটার দিকে কেউ একবার ফিরে তাকাচ্ছে না। রাস্তায় এমন অনেক তারা ছেলে দেখে এসেছে, রেখে এসেছে। ছেলেটার তো তবু ভাগ্য ভাল, মরবার পরে হলেও খাটে চড়বে!

কিন্তু এরাই তো সব নয়। মক্কেল-মুহুরি আছে, আমলা-ফয়লা আছে, কিছু চাঁদা জোগাড় হবে না? সন্তোষ আদালতের হাতার মধ্যে এগিয়ে গেল। সাক্ষী-সাবুদ, দালাল-ফড়ে, মোড়ল-মাতব্বর—সবাইর কাছে সে হাত পাতলো। একখানা দড়ির খাটুলি।

দু'-পয়সা চার-পয়সা করে মন্দ উঠলো না। যত ওঠে, সন্তোষ তত হাত বাড়ায়। ছেলেটাকে নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দনকাঠ জ্বালিয়ে পোড়াবে নাকি? খাটুলি ছেড়ে যে প্রায় চৌদোলা জোগাড় হবে।

'কি, হল কত ?' নারন জিগগেস করল।

পরনে পা-জামা, পায়ে কাবলি চটি। অনেক তাজা ও তেজী। এখানকার রায়সাহেবের ছেলে। কমিউনিস্ট।

নাম ছিল নারায়ণ। সেটা নিতান্ত হিন্দু নাম বলে নারনে বদলে নিয়েছে। নারন মানে না-রণ ; যুদ্ধ নয়, আপোষ।

'কি, পেলেন কত ?' নারন হুমকি দিলে।

'প্রায় সাড়ে চারটাকা—' সন্তোষ বললে হাতের মুঠি খুলে।

'তবেই দেখুন, রাই কুড়িয়েই বেল—মেনি এ পিক্‌ল্ মেকস এ মিক্‌ল ! কি হবে এত পয়সা দিয়ে ?'

'খাটুলি, দড়ি, কাঠ, কলসী—অন্তত গামছা একখানা—'

'হ্যাঁ—শবের আবার শোভাযাত্রা ! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। আপনাদের যত সব বাজে সেন্টিমেণ্ট। দিন, পয়সাগুলো দিয়ে দিন আমাকে।'

সন্তোষ যদিও বয়েসে নারনের চেয়ে এক যুগ বড়, তবু নারনেরই এখন দাবি বেশি। তারই এখন পড়তা পড়েছে। পাল্লা এখন তারই দিকে ভারি। শিষ্য-শাগরেদ এখন সব তার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে পয়সাগুলি নারন তুলে নিল।

বললে, 'দুটো বাঁশ আর কিছু দড়ি হলেই যথেষ্ট। যে মরে গেছে তার জন্যে আবার মায়া কিসের ?'

'এক খানা বাঁশের দাম এক টাকা। আর দড়ি—'

'কিনবে না আরো কিছু ! ওই সামন্তদের বাঁশঝাড়—দু'খানা কেটে নিয়ে আসব জোর করে। আর, খোঁটায় ঐ গরু বাঁধা দেখছেন ? দড়ির জন্য ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'অন্তত একখানা মাদুর—'

'আপনাদের যত সব পচা সেন্টিমেণ্ট। মর্গে কেমন মড়া নিয়ে যায় দেখেন নি? তেমনি বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব। মাদুর, না গালচে এনে দেবে মখমলের!'

'ও তো আর মুর্দাখানার মড়া নয়।' সন্তোষ আপত্তি করে।

'বেশ, মাদুর লাগে, মুহুরিদের কারু সেরেস্তা থেকে টেনে নিয়ে আসবেন একখানা।'

'কেন, এ পয়সা দিয়ে তুমি কি করবে?' সন্তোষ প্রায় রুখে উঠল।

'যারা এখনো মরেনি তাদের সৎকার করব।'

'তার মানে?'

'এই যারা ভিখিরি হাঁপাচ্ছে বসে-বসে, তাদেরকে খাওয়াব। বেলের শুকনো খোলাটা নোখ দিয়ে কেমন আঁচড়াচ্ছে ঐ বুড়ো, দেখছেন? ঐ মেয়েটা কেমন পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে?'

প্রথমটা সন্তোষ বলতে পারল না কিছুই। যেন ঠেকে গেল, হোঁচট খেল। মৃতের চেয়ে মুমূর্ষুকেই যেন বেশি অসহায় মনে হল।

কিন্তু, না, তা কি করে হয়?

'খাওয়াতে চাও, তার জন্যে তুমি আলাদা চাঁদা তোলো। আমি ওর নাম করে তুলেছি, ওরি জন্যে তা খরচ করব।'

'যারি জন্যে তুলুন, পাঁচ জনের পয়সা পাঁচ জনের কাজে ব্যয় হবে। এখানে এখন এক জনের চেয়ে পাঁচ জনের দাবি বেশি।' নারান চিবুকটা ভারি করল।

আশ্চর্য, পাঁচজন যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাদেরো তাই মত। যে আগেই মরেছে, তার চেয়ে যে এখুনিই মরবে তার ব্যবস্থাটাই আগে।

'ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই।' মুরুব্বি-মতন কে একজন রফা-নিষ্পত্তি করতে এগিয়ে এল। 'খাটও হোক খাওয়াও হোক।'

'খাট হবে, না হাওদা হবে!' পয়সা নিয়ে নারন চলে গেল দোকানের দিকে।

কাঙালদের খাওয়াতে হয়, তার বন্দোবস্ত তো সন্তোষই করতে পারত। কর্তৃত্বের ভার তার হাত থেকে এমনি কেড়ে নেয়ার মানে কি! এযে প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসা। উড়ুক্কু ফাজিল কোথাকার।

এক ধামা মুড়ি কিনে নিয়ে এসেছে নারন। সঙ্গে বোঁদের ছিটে। ক্ষুধার্তের দল হাউ-মাউ-খাঁউ করে উঠল।

নারন ভেবেছে কি। সন্তোষ ফের নতুন করে চাঁদা আদায় করবে। এবার বনেদি বাবুর মহলে। দেখি ছেলেটার জন্যে খাটুলি জোগাড় হয় কি না।

যাদের পরনে কানি-নেকড়া আছে, অতি কষ্টে তারি এক প্রান্ত খুলে মুড়ি নিচ্ছে দু'মুঠো। যাদের তাও নেই বা টেনে খুলতে গেলে ফেঁসে যাবে, তারা নিচ্ছে আঁজলা করে। কেউ বা কচু বা কলার পাতায়।

অনেক হুড়-দঙ্গল। কেউ বলে, বোঁদে পড়েনি এক কণা। কেউ বলে, থাবা মেরে কেড়ে নিয়েছে ও।

'এবার কিছু এ বেলের খোলে দাও, বাবা।' সরু ঠ্যাঙে টলতে-টলতে সেই বুড়ো আসে এগিয়ে। 'দেখছনা, ওরও পেট কেমন খোলে পড়ে আছে।'

নারন ধমক দিয়ে ওঠে।

'অনেক দূর যেতে হবে, বাবা। খেয়ে না নিলে গায়ে জোর হবে কেন?'

কিছু না ভেবেই পক্ষপাত করে ফেলে নারন। অনেক দূর যেতে হবে—কথাটা কেমন যেন সত্যি শোনায়। তাদের দলের কথা।

কোথায় বা খাটুলি কোথায় বা বাঁশ-দড়ি, ছেলেটা তেমনি উপুড়

হয়ে শুয়ে আছে। উড়ে-উড়ে বসছে কতগুলি কুকুরে-মাছি। থেকে-থেকে ঝরে পড়ছে কটা শুকনো পাতা।

কে একটা লোক, বলা-কওয়া নেই, সরাসর ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গা-পা খালি, হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে কোমরে আঁট করে বাঁধা। মাথায় গামছার ফেটি।

'কে, কে তুই?' বেকার দর্শকের দল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'আমি মুর্দফরাস। মুনসিপালির ডোম।'

'দাঁড়া, খাটুলি আসছে।' বললে সন্তোষের লোকেরা।

'দাঁড়া, বাঁশ কেটে দিচ্ছি। মাদুর আর দড়িও জোগাড় হয়ে যাচ্ছে এখুনি।' বললে নারনের শাগরেদরা।

ভূষণ ডোম উসখুস করতে লাগল। বাঁশ-দড়ি নিয়ে নন্দ ডোমেরও আসবার কথা পিছু পিছু, তারো দেখা নেই। কোন দিকে কেটে পড়ল কে বলবে।

সুন্দর ছেলেটা। একেবারে হাড়-গোড় বের করা নয়। আশ্চর্য, পেটটা এখন ফুলো, যেন কত খেয়েছে। মাথায় একরাশ চুল। ঠোঁটের কাছে দুদিকের দুটো টানে মুখখানা যেন মায়ায় ভরা।

কোথায় কাটা বাঁশ, কোথায় বা দড়ির খাটুলি। কোথায় বা নন্দ ডোমের কাঁধ! ভূষণ দু'হাত দিয়ে ছেলেটাকে হঠাৎ বুকে তুলে নিল। এমনি পাঁজা কোলে করেই নিয়ে যাবে তাকে শ্মশানে। হাত ব্যথা করলে কাঁধে তুলে নেবে। এক কাঁধ থেকে না-হয় আরেক কাঁধে।

তখন জল খাবার সাড়া পড়ে গেছে ভিখিরিদের মধ্যে। অনেক জল তারা খেয়েছে, কিন্তু খাওয়ার পরে খায়নি এমনি অনেকদিন। এমনি নোনতা-নোনতা মিষ্টি-মিষ্টি মুখে। জলের স্বাদ বেড়ে গেছে অনেক।

'দাঁড়া বাবা, আমিও খেয়ে নি।' বললে সেই বুড়ো। পুকুরের ঢাল ধরে তরতর করে নামতে গিয়ে পড়ে গেল আচমকা। তখুনিই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিছু না, কিছু না। গায়ে এখন জোর হয়েছে অনেক। এবার পেটে জল পড়লেই হাঁটতে পারব অনেক দূর।'

প্রায় এক পো রাস্তা হেঁটে এসেছে ভূষণ। খানিকটা পথ কেউ-কেউ এসেছিল পিছু-পিছু। সন্তোষের দল হরিধ্বনি দিতে চেয়েছিল, নারনের দল উঠেছিল শাসিয়ে। বলেছিল ডোমের হাতের মড়া, ও সব সাম্প্রদায়িক ডাক চলবে না।

ভূষণ লক্ষ্য করে দেখেনি কতদূর গড়াল সেই ঝগড়াটা। কেননা আর এগোয়নি তারা তারপর।

এতক্ষণে পুলের কাছে নন্দর সঙ্গে দেখা। বাঁশ আর দড়ি নিয়ে এসেছে। বাঁশ বলতে ঘরপোড়ার একটা খুঁটি, আর দড়ি বলতে কাতা।

'দে, বেঁধে ফেলি এবার।' মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে নন্দ বললে।

'এতক্ষণ ছিলি কোথায়?' ভূষণ খেঁকিয়ে উঠল।

'গাঁজা কিনতে গিয়েছিলাম।'

ভূষণের রাগ জল হয়ে গেল নিমেষে। জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল।

'এরি মধ্যে তুই যে ঘাড়ে করে লাশ নিয়ে আসবি তা কে জানে। দে, বেঁধে ফেলি চটপট। আমার ট্যাঁক থেকে কলকে খুলে নিয়ে ততক্ষণ ধরা এক ছিলিম।'

ভূষণ ছেলেটাকে নামিয়ে রাখছিল মাটির উপর, পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যস্ত হয়ে, 'না না, বাঁধতে হবে না। ওকে এবার আমার কাছে দে। বাকি পথটুকু আমি নিয়ে যেতে পারব।'

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল দু'জন। কে-একটা বুড়ো। তে-ব্যাঁকা।

ভূষণ যেন চিনতে পেরেছে তাকে। পুকুর-পাড় দিয়ে যাবার সময়

তাকে যেন একবার ডাক দিয়েছিল। যেন বলছিল, দাঁড়িয়ে যেতে। তারপর কখন যে গুটি-গুটি চলে এসেছে পিছু-পিছু খেয়াল করেনি।

'খুব নিয়ে যেতে পারব। গায়ে এখন আমার অনেক জোর হয়েছে। খেয়ে নিয়েছি এক পেট। দে, বাছাকে দে এবার আমার কোলে। রোদ্দুরে বাছার মুখ কেমন আমলে গিয়েছে। কতদিন খায়নি! আর ও খায়নি বলেই তো আমরা আজ সবাই খেতে পেলাম।'

ভূষণের কোল থেকে ছেলেটাকে বুড়ো দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল। কিন্তু দু'পা হেঁটেই বসে পড়ল টলতে-টলতে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে। বললে, 'তোরা ততক্ষণ গাঁজা খা, আমি বাছাকে নিয়ে একটু বসি। জিরিয়ে নি।'

দস্যুর

কিদারের চাপ আর ডাকবাক্স, গ্রামের এইটুকুই শুধু আভিজাত্য।
র রানার আসে হাটবারে।

নইলে, আগে যেমন পাড়াগাঁ ছিল, এখনো তেমনি পাড়াগাঁ। জলা
ওড় আর ধানখেত। হঠাৎ এক একটা দাঁড়ায় বা ডাঙ্গা জায়গায়
বাস।

উত্তর পাড়া আর দখিন পাড়া। মানে ভদ্র পাড়া আর চাষাপাড়া।

ভদ্রপাড়ায় পাঠশালা। চাষাপাড়া থেকেই কেউ-কেউ আসে
তে। প্রায় তিন পো রাস্তা ধুলো-কাদা ভেঙে। তাদের মধ্যে
রই প্রথম ছাত্র।

আরো ছিল কয়েকজন। মাহিষ্য আর ক্ষীরতাঁতি। তারা আগেই
লিয়েছে। শুধু হলধরই নাম-দস্তখৎ পর্যন্ত ছিল। নাম সই করতে
রই ভাবল, ঢের হয়েছে। এখন আর কেউ বোকা পেয়ে বুড়ো
ঙুলের মাথা ধরে টিপ-সই করিয়ে নিতে পারবে না। কলম ছুঁইয়ে
া-সই করার জোচ্চুরি থেকে সে রেহাই পাবে।

বুঝে-সুঝে ধীরে-সুস্থে সে সই করে। সই করে নানান জায়গায়।
লের কানিতে, জবানবন্দির নিচে, হাতচিঠার নবলগবন্দিতে।

দস্তখৎই করতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না আগাগোড়া। বললে,
 খুলব। আমাদের নিজেদের ইস্কুল। আগে বলত চাঁড়াল, এখন
ছি তপশিলী। আমরা চাষবাস করছি করি কিন্তু আমাদের ছেলেরা
রি করবে।

দখিন পাড়ায় ইস্কুল বসল।

হোক ওদের পাকা দালান, আমাদের মাটির ঘরই ভাল। থাক
র পেটা-ঘড়ি, আমাদের ক্যানেস্তরা পিটিয়েই চলবে। ব্ল্যাক-বোর্ডে
কার নেই, আমাদের তালের পাতাই যথেষ্ট।

চলল আকচাআকচি। চলল ছেলে-ভাঙানো।

তবু দুটো ইস্কুলই টিকে রইল কোনোরকমে।

কিন্তু অন্তভাবে বদল ধরল চেহারায়। ভদ্রপাড়ায় জঙ্গল গজাতে সুরু করল। আশ-শেওড়া, কেয়োঠ্‌টি, ভাঁট আর শেয়াকুলের ঝোপ। ঢোলকলমি, মরিচা আর তেলাকুচার লতা। ঝোপঝাড়ের মাঝে হাড়গোড় বের করা দু'একখানা কুঁড়ে ঘর। পাকা ইমারত যা দু'একখানা আছে, ঝরে-ঝরে পড়ছে। জঙ্গলে-আগাছায় এত অন্ধকার, এক ঠাঁই থেকে আরেক ঠাঁইয়ে যেতে ভয় করে। থানা-সই হতে হয়।

দখিন পাড়ায় খোলা মাঠ, অঢেল ধানখেত। ঠাণ্ডা সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির হাতায় কলা-কচুর বাগান। গোয়াল-ঘর। পোয়ালকুঁড়।

ভদ্রপাড়া পড়তি। চাষাপাড়া উঠতি। চাষা এখন চাষী হয়েছে, হয়েছে অনেক সম্রান্ত। আর ভদ্ররা হয়েছে বেকার, বাউণ্ডুলে।

চাষাপাড়ার ইস্কুলে আরো উন্নতি হয়েছে। আগে তালপাতার ছিল, এখন হয়েছে খড়ের ছাউনি। ভেলকো বাঁশের খুঁটি। ক্যানেস্তেরার বদলে ঘণ্টা। চ্যাটাই ছেড়ে ছেলেরা এখন মাদুরে বসেছে। মাস্টারের মাইনে বেড়েছে আট আনা।

যাই হোক, নেই ওদের বেঞ্চি-চেয়ার, নেই ব্ল্যাকবোর্ড, নেই বা গ্লোব-ম্যাপ। ভদ্রপাড়ার ইস্কুল নাক উঁচিয়ে থাকে। বলে, গো-বস্তির পাঠশালা। ইস্কুল বলতে পর্য্যন্ত স্বীকার হয় না।

চলেছে এমনি টেক্কাটেক্কি—দেশে শিক্ষা-কর বসল। এলেন ইন্‌স্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'চলবে না ও-ইস্কুল।'

'কিন্তু দখিন পাড়ারটা?'

'ওটাও না।'

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক গ্রামে একটার বেশি ইস্কুল থাকতে রবে না। দুই ইস্কুল মানেই দুই দল, চলবে না আর কলহ-কচকচি। ছাড়া, দুই ইস্কুলকে খয়রাতি করবার মত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পয়সা নেই।

'বেশ তো, এক ইস্কুলই যদি রাখতে হয়, আমাদেরটাই থাকুক।' পাড়ার কে বললে, 'এটাই হচ্ছে সব চেয়ে পুরানো। পাকা বাড়ি, ঞ্চি-চেয়ার, ঘড়ি-ঘণ্টা—সবদিক দিয়ে এরই হক-হকিয়ত বেশি। ছাড়া এর গা ঘেঁসেই নলকূপ—ছেলেরা জল খেতে পারে। নতুন কোনো জায়গায় ইস্কুল বসাবেন, কম-সে-কম হাজার টাকা খরচ। ড়ি চাই, আসবাব চাই, নলকূপ না হলেও পুকুর চাই জল খাবার। ই রাস্তাঘাট। অত জুটবে কোত্থেকে?'

যুক্তিগুলোকে এক কথায় হটিয়ে দেয়া যায় না। ইন্‌স্পেক্টর সেদিক য়ে গেলেন না। বললেন, 'পাশেই যে ঠাকুরের থান।'

পাশেই কালীতলা। রক্ষাকালী। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগে তখনই জা হয় মহানিশায়। তাও ক্কচিৎ-কদাচিৎ।

তাহলে কি হয়, পাঁচ জাতের ছেলে নিয়ে ইস্কুল, সবাইর মন বাঁচিয়ে তে হবে। যে রক্ষা করবে সেই যদি অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে সেটা খুব স্তির ব্যাপার হবে না।

'ঠিক, ঠিক।' হলধর-মহীধররাও উলটো দিকে তরফদারি করতে গল।

পঞ্চাশ বছরের উপর এই ইস্কুল। পঞ্চাশ বছরের উপর এই ঠাকুরের য়গা। শেষকালে তোরাও উলটো গাইলি? তুই হরি ঘড়ই? অঘোর কয়াল? তুই রামতারণ দুয়ারি?

একটা জিনিস অনেকদিন ধরে চলেছে বলেই চিরকাল চলবে এমন

কোনো কথা নেই। তাহলে আর মহাজনী আইন হত না, হতনা ঋণ
শালিসী। তবে চিরকালই ওরা ফৌত-ফেরার হয়ে থাকত। তাই না?

'তবে ইস্কুল হবে কোথায় ?' তিক্ত গলায় ভদ্রপাড়া জিগগেস করলে

'আমাদের দখিনপাড়ায়।' ফুর্তিতে উজিয়ে এল তপশিলীরা।

না, তাও না। দখিন পাড়ার ইস্কুলটা একেবারে এক টেরে
ওখানে হলে ভদ্রপাড়ার ছেলেরা অসুবিধেয় পড়বে। ইস্কুল হবে গাঁয়ে
মধ্যিখানে। প্রায় রশি মেপে। যাতে কোনো পাড়ারই না নালি
থাকে।

ইনস্পেক্টর 'সাইট-সিলেকশন' বা স্থান নির্ণয় করলেন। চণ্ডীবাওড়ে
ধারে। নামেই শুধু চণ্ডী। তা নিয়ে কারু আপত্তি নেই। কেন
খোদ গাঁয়ের নামই বিবিবাজার।

দড়ি ধরে সমান-সমান মাপতে গেলে ইস্কুল এনে বসাতে হয় ধ
খেতের উপর, বিলের মধ্যে। তাই, উপায় না দেখে ইনস্পেক্টর ভ
পাড়ার দিকেই একটু আলগা দিলেন। চণ্ডীবাওড়ের ধার ভদ্রপা
সীমানায়।

কোনো পাড়াই খুশি হলো না। তবু অন্তের ইস্কুলটা চালু হলে
বলে দু' পাড়াই খুশি হলো।

যে জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে সেটা নিবারণ বোস গয়রহের। হ
পাঁচ শরিক। অংশ নিয়ে ঝগড়া। একেক বছর একেক জন উপ
মালেকের ঘরে খাজনা দেয় আর ভর্তখোর মামলা করে। তবু আপ
করে আপোষে বা আদালতে কিছুতেই বাঁট করে নেয় না।

বিবাদী জমি—দিয়ে দিক ইস্কুলের কাছে, ভদ্রপাড়া ধরল
বোসেদের। এ রাজি হয় তো ও রাজি হয় না; ও রাজি হয়
এ সেলামি চায়। তাছাড়া জমিতে কোল-রায়ত আছে,

চাঁধরদের জাতকুটুম—হিরেলাল মিদ্দে আর নন্দলাল সানাইদার। চাষাপাড়ার পরামর্শে তারা জমি ছাড়তে চায় না। খাজনা পাওনা আছে বকেয়া, উৎখাতের নালিশ করে দিলেই হয়। তবু বোসেরা উঠে যেতে চায় না। গাঁয়ে একটা ইস্কুল হলেই বা কি, উঠে গেলেই বা কি! কে আবার যায় ও সব নালিশ-ফয়শালার মাঝে!

'কই গো বাবুরা, জমি কি হল?' চাষাপাড়া ব্যস্ত হয়ে এসে জিগগেস করে।

'এই হচ্ছে—' বাবুরা কান চুলকোয়।

'তোমরা অনেক নেকাপড়া শিখেছ তোমরা সবুর করতি পার আমরা পারি না।' চাষাপাড়া ঘোঁট বাঁধল।

এ-জমি ছেড়ে ও-জমি, চণ্ডীবাঁওড় ছেড়ে কালীবাঁওড়, কোথাও ভদ্রলোকেরা জমি পেল না। বিনা মুনফায় সূচ্যগ্র মেদিনী দান করতে কেউ প্রস্তুত নয়।

দখিন পাড়ার দিকে ষষ্ঠী আঁটুলির খাদাড় পড়ে আছে, তারই উপর চাষাপাড়া ঘর তুললে। দোচালা ঘর। বললে 'এই আমাদের ইস্কুল।'

এই আমাদের ইস্কুল। চাষাভূষোরা কাস্তে দিয়ে খাগ কেটে কলম বানালে।

'ঠাকুরদের বললাম, দেউ স্কুলো গেড়ে, ঠাকুরেরা তা শোনলেন না।' জলধর বললে মুরুব্বির মত: 'ও বল নিজেদের কোলে ঝোল টানবে। তখন বললাম উমাচরণের ভিটেয় একখানা দোচালা তুলে দিই! তা দেবে কেন, তাতে ভটচাজ্জি মশায়ের ক্ষেতি হবে যে। সব শালা বিটলে। বাবুদের ক্ষেমতা কত বুঝেছি। ওদের ন্যাজ ধরে আর থাকব না। আর একবার খাড়া করাতি পেরেছি, আমাদের এখন পায় কে। আমাদের

দিকে ফজু মিয়া আছে, রজবালী আছে, মোমরেজ আছে—কারুর আমরা আর তোয়াক্কা রাখি না।'

'ষষ্ঠীর সঙ্গে একটা নেকাপড়া করে নিলে হত না?' কে একজন টিপ্পনি কাটল।

'নেকাপড়া না আরো কিছু! ষষ্ঠী যদি কিছু হেড্ডাপেড্ডা করে তবে তার গলা টিপে সাত হাত জিব বার করে ফেলব। কি রে ষষ্ঠী, গোলমাল করবি নাকি?'

ষষ্ঠী সামনেই ছিল, লজ্জিতের মত মুখ করে বললে, 'আমি কি ভদ্দরলোকের মত ছোটলোক?'

ফজলে রহমান হল ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট।

আর হলধর বললে, বুক ফুলিয়ে, 'আমি ভাই-প্রেসিডেন্ট।'

গ্রামের মধ্যে প্রথম অবৈতনিক স্কুল। একেই স্বীকৃতি দিলেন ইন্স্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার টনক নড়ল। ইন্স্পেক্টরকে গিয়ে ধরে পড়ল, 'সেই যখন মধ্যিখানেই ইস্কুল হল না, তখন আগের মত দুটো ইস্কুলই চলুক না। ওরা নতুন করেছে করুক, আমাদের পুরোনোটাও বেঁচে উঠুক।'

'দুটো স্কুলকে গ্র্যাণ্ট দেবার মত পয়সা নেই।'

'নেই তো, ঐ বেজায়গার ইস্কুলকেই বা দেবেন কেন?'

'আপনারা পারলেন না, ওরা পারল, ওদেরই তো দেব একশোবার। ঠিক মধ্যিখানে না হলেও একেবারে সীমানায় হয়নি। দু' পাড়ার ছেলেরাই বেশ আসতে পারবে।'

তর্ক করা বৃথা। তাই ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে ষষ্ঠী আঁটুলিকে। বললে, 'উকিল মুহুরি কিছু লাগবে না তোর, দে এক নম্বর মামলা ঠুকে। অদানে অব্রাহ্মণে যাবে অমন জমিটা!'

ষষ্ঠী চোখ পাকিয়ে বললে, 'খবরদার, ইদিকি এসো না বলে দিচ্ছি। ওসব মন্দ কথায় আর কান দিচ্ছি নে। অনেক ন্যাকরা করেছ, আর লয়।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল সবাই। উপায় কি।

উপায় ফের সেই ইন্‌স্পেক্টরকেই ধরা। তাঁকে বোঝানো, এক ইস্কুলে সমস্ত গাঁয়ের সমান সুবিধে হবে না। উত্তর পাড়া দূরে পড়বে, ঠকবে। দাঁড়ায়-দাঁড়ায় বসবাস, মাঝখানে বাদা-বাঁওড়—গ্রামের যেরকম অবস্থিতি দু' অঞ্চলে অনায়াসে দুটো ইস্কুল চলতে পারে। সরকার থেকে দুটো ইস্কুলকেই গ্র্যাণ্ট দেয়া উচিত।

ইন্‌স্পেক্টর নরম হলেন। বললেন, 'জমি পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। বোসেরা এতদিনে রাজি হয়েছে।'

এ উত্তর শুনবেন আশা করেননি ইন্‌স্পেক্টর। বললেন, 'বেশ, সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইস্কুলের জন্যে দরখাস্ত দিন, বিবেচনা করব।'

দরখাস্ত লিখে তার উপর সই নেয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে। তাই চাঁই মুসলমান ও তপশিলীদেরও সই দরকার।

ভাগাধর মাঝি ইস্কুলের 'ছেরকট' বা সেক্রেটারি। সে বললে, 'তা—আমরা এট্টা ইদিকি করিছি, তোমরা—আপনারা এট্টা ওদিকি করবা, তাতে আমাদের কি? করতি পার কর। আমরা ওর মদ্দি নেই।'

'গ্রামে দুটো ইস্কুলই তো ছিল। সেই দুটোই যদি আবার হয়, তবে লোকসান কি?'

'লোকসান? তোমরা আমাদের পাঠশালাটা খাবা, তারই ফন্দি আঁটছ। আগে তো আমরা বলেলোম তোমাদের ইস্কুলডাই হোক্,

তোমরা ঠাকুররা তো ফেসে দিলে। এখন সাউগাড়ি করতে আসেছ। ওসব হবেটবে না। তোমাদের ইস্কুল তোমরা ছাখবা, আমরা আমাদের ছাখব। তখন ঘরখানা বাঁধবার জন্নি কত ব্যাগস্তা করেলাম, বাবুদের ম্যাজাজ কি! আর এখন আমরা নিজিরা যেই এট্টা খাড়া করেছি—গা জালা করতি লেগেছে।'

'তোমাদের ইস্কুল তো আমাদেরও ইস্কুল।' ভদ্রপাড়া পিঠে হাত বুলোয়ঃ 'আমাদেরটাও তোমাদের। গোটা কতক সই জোগাড় করে দাও।'

'ও-সব সই-সাবুদে আমরা নেই। আমাদের কমুটি আছে। সেই কমুটি যা বলবে তাই হবে।'

'আচ্ছা, বেশ তো তোমাদের কমিটি আজ ডাক, আমরাও থাকবোখন।'

'কনে বসবা?'

'ভটচাজ্জি বাড়ি।'

'আচ্ছা বলে দেখি আর সব মুরুব্বিদের। যদি রাজি হয়, যাবনে।'

'যাবোখন নয়। যেয়ো ভাই লক্ষ্মীটি।' ভদ্রপাড়া প্রায় পায়ে হাত বুলোয়ঃ 'দরখাস্তটা শিগগিরই দাখিল করতে হবে।'

'হেঁ-হেঁ ঠাকুর, তোমাদের তাড়া আর আমাদের তাড়া এক নয়। বুঝলে?' ভাগ্যধর অদ্ভুত করে হাসলঃ 'সে দিনকাল আর নেই। তোমাদের চোল আমরা বুঝি।'

ভাগ্যধর হলধরের বাড়ি গেল। হলধর দাবায় উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। সব শুনলে আগাগোড়া। চুপ করে রইল।

'ভদ্দরলোকেরা যাতি বলতেছে। যাবি?' জিগগেস করলে ভাগ্যধর।

'হেঁ-হেঁ, তুই লে-লে।' হলধর ঘৃণায় ঝংকার দিয়ে উঠল: 'কি করতি যাবি? কেবল কথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলবে'নে, আমরা কিছুই জবাব দিতি পারব না। তলে-তলে কাজ গুছিয়ে নেবে।'

ভদ্রপাড়া ফজলে রহমানের বাড়ি গেল। রহমান এক গাল হেসে বললে, 'সই করতি শিখেলোম কবে?'

'তবে অন্তত টিপ সই দাও।'

'ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে বুড়ো আঙুল জুড়ো পুড়ে গেছে।' রহমানের জুটো আঙুলেই ন্যাকড়ার টিপলি।

অন্তত ভাই-প্রেসিডেন্টের সই হলেও খানিক মান থাকে। গেল সবাই হলধরের বাড়িতে।

'শুধু একটা দস্তখৎ দে, হলধর।'

হলধর ঝিম মেরে রইল। শুধু একটা দস্তখৎ। তার নামের দস্তখৎ।

দারোগা এজাহারে সই করে। হাকিম রায়ে সই করে। লাটসাহেব সনদে সই করে। তেমনিই আজ তার দস্তখতের দাম।

'যে ইস্কুল তোকে দস্তখৎ করতে শিখিয়েছে সেই আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে, হলধর—' ভদ্রপাড়া কায়দা করে কথা ছুঁড়ল।

'কই দেখি দরখাস্তটা।'

উলটে-পালটে দেখতে লাগল হলধর। বললে, 'কিছুই পড়তি পাচ্ছি না যে।'

'পড়বার কিছু দরকার নেই। শুধু দস্তখৎ করে দে।'

হলধর হাসল। অশিক্ষিত বটে, কিন্তু বড় জ্ঞানীর হাসি। বললে, 'এতদিনে, এত বচ্ছর ধরে শুধু নাম-দস্তখৎটাই শিখোয়েছ। পড়তি

শেখায়োনি কাঁচকলা। পড়তি শিখলেই যে সব ধরে ফ্যালব। তাই জোর করে রেখোছ কেবল অন্ধকারে।'

'বেশ তো, তোমাকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি।'

'শোনা কথায় আর বিশ্বাস নেই ঠাকুর। আমার ছেলে গেছে আমাদের ইস্কুলে। লেখাপড়া শিখে আসুক সে লায়েক হয়ে। তখন সে পড়ে দেখবেনে দরখাস্ত। আমার বদলে তখন সেই সই করে দেবেনে। তদ্দিন থাক এটা আমার ঠেঙে। কি বল আপনারা?'

হলধর দরখাস্তটা সযত্নে ভাঁজ করতে লাগল। ভাঁজ করে গুঁজে রাখল চালের বাতায়।

জনমত

চড়ুই-পাখিদের দেশে একটা ময়ূর উড়ে এসেছে।

'ইং লেউ ইং --'

সেই পরিচিত স্বর। সেই পরিচিত ভারি পায়ের শব্দ। কিন্তু তেমন যেন আর সাড়া জাগায় না। আগে-আগে ভয় পেত সবাই, এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিত। এখন দিব্যি সবাই পথের উপর এসে দাঁড়ায়, পষ্টাপষ্টি তাকায় মুখের দিকে। আগে কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এখন যেন কৌতূহলের, হয়ত বা কৃপার চোখে দেখছে। হল কি হঠাৎ? সে যেন সেই ডাকসাইটে ডাকাত নয়, ফকির মুসাফির।

মামুদ খাঁ হাসে মনে-মনে। হাতে লাঠি, জামার নিচে গায়ের চামড়ায় গরম হয়ে আছে ভোজালি।

'ইং লেউ ইং--'

কেউ যেন তাকিয়েও দেখে না। দেখলেও হাসে। অবজ্ঞার হাসি।

লোকজন অনেক বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু বন্দর-বাজার তেমনিই আছে নদীর ধার ঘেঁসে। সেই সব হোগলাপাতার চটি, বসেছে মুদি-মনোহারি বাজে-মালের দোকান। আছে সেই বড়-বড় মহালীর দোকান, পেঁয়াজ-রশুন মরিচ-তেজপাতা টাল করা। সেই কাঠ-কাঠরার আড়ৎ। চলেছে সেই দর্জির কল, কিস্তিটুপি আর দালমান সেলাই করছে। লোহার-কামারের দোকানে নেহাইয়ে ঘা পড়ছে হাতুড়ির। হাসিল-ঘরে রসিদ দিয়ে গরু আর মোষ বিক্রি হচ্ছে। নৌকো এসেছে কাঁচামালে বোঝাই হয়ে, গুড়ের হাঁড়ি, তামাক আর ধান-চালের বেসাত নিয়ে। খেয়ার পাটনী তোলা তুলে নিচ্ছে। গাছের ছায়ায় কামাতে বসেছে নাপিতেরা। সবই সেই আগের মত। সেই আগের মতই বিকেল।

তবু, যেন হাওয়া শুঁকে টের পাওয়া যায়, দিন কি রকম বদলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, নতুন বাঁশের ছাউনি হয়েছে কতগুলি।

'কি এই সব?' এক জনকে জিগগেস করলে মামুদ খাঁ।

লোকটা বললে, 'এফ-আর-ই।'

মামুদ খাঁ হাঁ হয়ে রইল।

'হাসপাতাল। দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল।'

হ্যাঁ, বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা ভাসা-ভাসা শুনেছে মামুদ খাঁ। পাখার এক ঝাপটায় অনেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেক লোক চলে এসেছে কঙ্কালের সীমানায়। তাদের কাছে আসেনি মামুদ খাঁ। এই বাজারেই যারা মুনাফা মেরে মোটা হচ্ছে, এসেছে তাদের কাছে।

'এই মেরা রূপেয়া লেউ।' মামুদ খাঁ পাকড়েছে ননীলালকে।

ননীলাল যেন একটুও ভয় পায় না। যেন খুব অবাক হয়েছে, এমনি ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়। বোধ হয় মুচকে-মুচকে একটু হাসেও।

'হাসতা কিঁউ? মেরা রূপেয়া লেউ।'

ননীলাল তবু ভড়কায় না এক-চুল। আগে-আগে পালাত আনাচ-কানাচ দেখে। দিনের বেলায় কোন দিন মুখোমুখি হবার সাহস পায়নি। আজ দিব্যি হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে।

বলে, 'টাকা কিসের?'

টাকা কিসের! মামুদ খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ভাবে

পর্ধা কি লোকটার! মামুদ খাঁর হাতের লাঠি কি বেদখল হয়ে গেছে? ং ধরেছে কি তার ইস্পাতের ভোজালিতে?

পাঁচ বছর ফাটকে ছিল মমুদ খাঁ। তার লাঠির গাঁটে পাথরের জবুতি ছিল, ভোজালির মুখে ছিল লক্‌লকে আগুন। জেল থেকে বরিয়ে মামুদ খাঁ কিছু বে-তাগদ হয়েছে, লাঠিতে যেন আর সেই লাফ ই, ভোজালিতে নেই আর সেই রাগ-থেকেই-রক্তের ভোজবাজি। ইলে সেদিনের ননীলাল কি না বলে, টাকা কিসের!

'তুম শালা দিললাগি করছ হামার সাথ! হামি আদালত যাব।'

ননীলাল হেসে ওঠে গলা ছেড়ে। বলে, 'সেদিন আর নেই, খাঁ হেব।'

সত্যি, সেদিন আর নেই। নইলে মামুদ খাঁ আদালতের রাস্তা তলায়! কে না জানে, কত দিন তামাদি হয়ে গেছে তার টাকার বি-দাওয়া। তবু কি না আজ সে না-মরদের মত আদালতের নাম র। নালিশবন্দ হয়ে জবানবন্দি করবে! ছেঁচড়া উকিল-মোক্তার র-মুহুরির তাঁবেদার হবে! দিন-কাল বদলেছে বই কি!

তবে কি ননীলাল উপস্থিত দুর্ভিক্ষের দোহাই পাড়ছে? ননীলাল া না বেহুদা বদমায়েসি করে! তার 'ভাসানে' ব্যবসা ছিল, শহর কে বাজে মাল কিনে এনে নৌকো করে গাঁয়ের হাটে-হাটে বিক্রি ত, তার আলমাল বেড়েছে বই কমেনি একটুও। আগে মাটির টা হাঁড়ি বেচে সেই হাঁড়ির মাপে চাল নিত, এখন এক হাঁড়ি চাল । প্রায় এক হাঁড়িই টাকা নিয়ে যায়। তার এখন ফালাও কারবার। দেদার টাকা না হলে ডাকাবুকো হয়ে দাঁড়ায় অমন মুখোমুখি?

কিন্তু মামুদ খাঁও একেবারে মরে যায়নি।

আরও দু'চারজন জুটেছে এসে ক্রমে-ক্রমে। মোগলাই কাবা, ঘুকলি-

দেয়া পায়জামা, জরিদার মখমলের ওয়েস্টকোট অনেক দিন পর এ অঞ্চলে একটা সোর তুলে দিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে বহুরূপী এসেছে সে। যেন কেউ তাকে চেনে না, দেখেনি কোনো দিন।

এই যে নবী-নওয়াজ। জমিদারের তশিলদার। একবার তবিল ভেঙেছিল বলে গ্রেপ্তারি বেরিয়েছিল তার নামে। মামুদ খাঁর থেকে চড়া সুদে দু'শো টাকা ধার নিয়ে দু'বছরে মোটে কুড়ি টাকা শোধ করেছিল সে।

'এই মেরা রুপেয়া লেউ।'

প্যাঁকাটে চেহারা, মাড়ি বের করে দস্তুরমত হাসে নবী-নওয়াজ। বলে, 'টাকা গেছে দেশান্তরী হয়ে।'

'তুম শালা তো আছ আমার কবজার ভিতর—' মামুদ খাঁ তেড়ে আসে।

'ও দিন-কাল আর নেই, খাঁ সাহেব। ও সব টেঙাই-মেঙাই আর চলবে না।'

আশ্চর্য, কেন কে জানে, মামুদ খাঁ গুটিয়ে যায় আচমকা। আগে কেমন টগে-টগে থেকেও নবী-নওয়াজকে ধরতে পারত না, এখন চোখের সামনে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাচ্ছে না বাগাতে।

'আইন-ফরমান সব বদলে গিয়েছে। সুদখোরদের ভাল ওষুধ বেরিয়েছে এব্বার।'

আইন-ফরমানকে মামুদ খাঁ কবে তোয়াক্কা করেছে শুনি? আজও তাতে তার টনক নড়ত না, কিন্তু আজ সে চমকাচ্ছে নবীলালের সাহসে, নবী-নওয়াজের মাড়ি-বের-করা নিশ্চিন্ত হাসিতে। বাজার বন্দর গোলা-আড়ত সব তেমনি আছে, কিন্তু, কি আশ্চর্য, সব থেকেও যেন কি নেই।

নেই আর তার পিছনের জোর, জনতার সম্মতি।

কে বলে জোর নেই? জবরদার হাতে মামুদ খাঁ নবী-নওয়াজের হাত চেপে ধরল। টানতে-টানতে নিয়ে চলল সামনের দর্জির দোকানে।

তবু নব-নওয়াজ হাসে। যেন দর্জি-তাঁতি, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর, জেলে-মুচি, সব আজ তারা এক দল।

দর্জি কেতাব আলি। অনেক দিনের মহব্বতি তার সঙ্গে। এখানে বসে মামুদ খাঁর অনেক লেন-দেন হয়েছে, অনেক বুঝ-সমুঝ। হাতচিঠায় পড়েছে অনেক টিপটাপ। কেতাব আলিও তার কাছ থেকে ধার খেয়েছে, কিন্তু বেইনসাফি করে ঠকায়নি কোনো দিন। কত জনের জন্যে ফেলজামিন দাঁড়িয়েছে।

'পাল্লা বদল হয়ে গিয়েছে, খাঁ সাহেব। দেশে মহাজনী আইন বসেছে। এসেছে নতুন দিন, ফিরিয়ে দেবার দিন। অনেক দিন এ অঞ্চলে আসনি বুঝি? তোমার দোস্ত-দোসরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়নি? তারা তো কবে এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।'

উঁহু, কি করে জানবে? দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করে কয়েদ হয়েছিল তার। জেল থেকে বেরিয়ে সটান চলে এসেছে সে। এক ঘরওয়ালীর কাছে তার জামা-মেরজাই জুতো-পয়জার ছিল, তাই চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সব ছিঁড়ে-ফেড়ে গেছে, কনকনে শীতের হাওয়া ঢুকছে এসে হাড়ের মধ্যে।

কিন্তু আইনটা কি?

হাতের লাঠি নির্জীব হয়ে থাকে, ভোজালিটা ভোঁতা মনে হয়, মামুদ খাঁ জিগগেস করে, আইনটা কি?

দর্জির দোকানে বসে আদালতের পিওন সমন-নোটিশ জারি করে, রিটার্ণ লেখে। পোস্টাপিসের পিওন চিঠি বিলি করে, বোর্ডের ট্যাক্স-দারোগা ট্যাক্সো কুড়োয়।

আদালতের পেয়াদারই বেশি মান, বেশি দাপট। সে জানে-শোনে বেশি, সে একেবারে ভিতরের লোক।

সে বলে, 'এখন বাবা লাইসেন লাগে। যেমন লাগে বন্দুকের, মদ-গাঁজার। লাইসেন না নিয়ে তেজারতি করলেই হাতে হাতকড়া।'

টাকা কর্জ দিতে কে এসেছে? যে টাকা নিয়েছ তোমরা, তা ফিরতি দেবে না? এ কোন দিশি নয়া কানুন? আসল টাকাও গাপ হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, তামাদির গেরোর কথাটা জানা আছে মামুদ খাঁর। তার সে ভয় রাখে না। আদালতে যদি যেতেই হয় কোনো দিন, হাতচিঠাতে সে সুদের উশুল দিয়ে রাখতে জানে। কলম-ছোঁয়ানো সই করে রাখবার মত জালবাজের অভাব নেই। বটতলায় মিলবে অমন ঢের মুনসি-মুহুরি।

'নয়া কানুন না তো কি।' পাশের ঘরের মহেন্দ্র ডাক্তার তেড়ে এল: 'চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে চাষা-ভূষো বেপারি-কারবারি সবাইকে উচ্ছন্নে দিয়েছে, তাদের জন্যে নতুন আইন হবে না তো কি! সুদের সুদ, তস্য সুদ, যেন চক্কর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে বেড়েই যাচ্ছে, খোলের চেয়ে আঁটি হয়েছে বড়, হাঁ-এর চেয়ে খাঁই। আসল? আসল কবে ভূষ্টিনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।'

'নেহি, আসল অন্তত হামার চাই।'

'জানি না আমরা তোমার এই আসলের কারসাজি? দিয়েছ দশ

াকা, লিখেছ চল্লিশ। এখন সব বস্তা-বোঁচকা গাঁট-গাঁটরি খুলে দেখাতে
বে। এসেছে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার দিন।'

সত্যি, এ হল কি? গো-বদ্যি মহেন্দ্র সাপুই, ম্যালেরিয়ায়-ভোগা
চমসে চেহারা, সে পর্যন্ত আইনের চিপটেন ঝাড়ে। ত্যাড়া ঘাড়ে কথা
য়। চোখ পাকায়।

নিজেকে মামুদ খাঁর হঠাৎ অসহায় লাগে। বুঝতে পারে, তার
পিছনে আর জনতার অনুমতি নেই। তার জবরদস্তির পিছনে নেই
মার সেই ভয়ের বুজরুকি। যে ধার খায় সে যে অপরাধী নয়, সে যে
শুধু অপারগ, রটে গেছে যেন তারই কানাঘুসো। অপারগের দল এবার
াই একজোট হয়েছে। পেরেছে একজোট হতে।

কিন্তু কিছু অন্তত টাকা না পেলে মামুদ খাঁ দেশে ফিরে যায় কি
রে? তার কারবার যখন বরবাদ হয়ে গেল তখন দেশে গিয়ে সে
াষ-বাস করবে। হাল-বলদ কিনবে। হিং-এর চাষ করবে। কিন্তু
বিনি সম্বলে সে যাবে কোথায়? খাবে কি? গরিবপরওয়ার কেউ
নই তোমাদের মধ্যে?

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মামুদ খাঁ লজ্জায় মরে যায়।

'এক আধলাও কেউ দেবে না! শুষে-শুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে,
সোনার ডিম পাড়ত যে হাঁস, অতি লোভে তার পেটে ছুরি চালিয়ে
য়েছে—আছে কি আর আমাদের? যা তো থানায় গিয়ে খবর দিয়ে
ায় তো দারোগাবাবুকে।' মহেন্দ্র তড়পাতে থাকে: 'আজ কাল
াতকের বাড়িতে গিয়ে ধন্না দেয়া বা চারপাশে ঘুরনা দেওয়াও মারপিটের
ামিল। যা তো কেউ, দেখবি এখনি শালার আসখাস তলব হবে থানা
েকে।'

থানা-পুলিশের নাম শুনে মামুদ খাঁ জ্বলে ওঠে। বলে, 'তুম শালা

তো কম্বল নিয়েছিলে—তার দাম ভি আইন নাকচ করে দেবে? আচ্ছা দাম না দাও, হামার কম্বল ফিরিয়ে দাও।' মামুদ খাঁ সত্যি-সত্যি হাত পাতে।

'তুম শালা একখানা কম্বল দিয়েছ আর গায়ের ছাল তুলে নিয়েছ একশো জনের। সেই ছালে ডুগি-তবলা বানিয়েছ। আর আমরা হাড়-গোড় বার করে দাঁত খিঁচিয়ে মরে আছি। বেইমানি করার আর তুমি জায়গা পাওনি? যাও, বেরোও।'

শের ছিল, কুত্তা হয়েছে আজ। তবু বেইমান কথাটা সহ্য করতে পারে না মামুদ খাঁ। তার এক কালের বেদানা-খাওয়া রক্ত লাল হয়ে ওঠে। লাঠি তুলে আচমকা মারতে যায় মহেন্দ্র সাপুইকে।

ঐ মারতে যাওয়া পর্য্যন্তই। হাতের মুঠ তার আঁট হয়ে বসতে পারে না লাঠির উপর, ওরা তা অনায়াসেই কেড়ে নেয়। কাউকে কিছু বলতে হয় না, সবাই দাঁড়ায় এককাট্টা হয়ে। একসঙ্গে ঘাড়কাতা দিয়ে নামিয়ে দেয় তাকে দোকান থেকে। তার জামা ছিঁড়ে দেয়। পাগড়ি খুলে ফেলে। বাবরি ধরে টানে। ঢিল ছুঁড়ে মারে। একটা ঢিল লেগে কপাল ফেটে যায়।

বুকের উমে গরম হয়ে আছে যে ভোজালি, মামুদ খাঁ তা আর মনেই করতে পারে না।

স্পষ্ট বোঝে, জনবলের সঙ্গে পারবে না সে লড়াই করে। সমুদ্রে ভেসে যাবে কুটোর মত। আর গায়ের জোর জিতলেও জিতবে না দাবির জোর। তার দাবি থেকে দাব গিয়েছে খসে। তার স্বত্বে বোধ হয় আর সত্য নেই।

মামুদ খাঁ পালিয়ে যায় জোর কদমে। যায় খেয়াঘাটের দিকে।

কামারদের পিছনের গলি দিয়ে। পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন সে এসে পড়েছে এই গলির আশ্রয়ে।

বাড়ির মুখোরে নিত্যগোপী জলচৌকির উপর বসে জল দিয়ে চেপে-চেপে আরেকটা কে মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে।

নিত্যগোপী চিনতে পারল মামুদ খাঁকে। এ অঞ্চলেও সে তার হিং ফিরি করতে এসে কর্জ খাইয়ে যেত। শুধু নিত্যগোপীকেই জপাতে পারেনি। একখানা শাল দিয়েও নয়। নিত্যগোপী অনেক সম্ভ্রান্ত। সে কাবলিওলাকে ঢুকতে দেবে না তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

খড়ম পায়ে নিত্যগোপী উঠে দাঁড়াল। বললে, 'এ কি হল খান সাহেব?'

'চোর ধরতে গিয়ে জখম হয়েছি।' রক্তে মামুদ খাঁর কপাল ও গাল ভেসে যাচ্ছে।

'সে কি কথা, এসো আমার বাড়িতে। বাবুকে ডাকাই। ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিক।'

কোনো দিন সাধ ছিল বুঝি মামুদ খাঁর, নিত্যগোপীর ঘরে যায়। আজ নিত্যগোপী তাকে ডাকল, কামনার মত নয়, শুশ্রূষার মত।

বললে মামুদ খাঁ, 'দরিয়ার পানি জবর নোনা, থোড়া পানি খাওয়াতে পারবে?' ছোট উঠোন পেরিয়ে নিত্যগোপী তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘটি করে জল দিল খেতে।

মামুদ খাঁর মুখে ঘটিটা আর কাৎ হল না। দেখল নিচু-মতন একটা তক্তপোষে কতগুলি কম্বলের থাক। লাল মোটা কম্বল। প্রায় এক শো। কিংবা তারো বেশি।

'এ ক্যা?'

'বাবু এক গাঁট সরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে। ঐ দুর্ভিক্ষের

হাসপাতাল থেকে। বাবু ওখানে এখন চাকরি করছে কি না—' সমপর্যায়ের ব্যবসায়ী ভেবে নিত্যগোপী বললে নিশ্চিন্ত হয়ে।

'কে তোমার-বাবু?'

'মহেন্দ্র বাবু। খলিফার দোকানের পাশেই যার দাওয়াইখানা। দুর্ভিক্ষের দিনে খুব পয়সা করছে দু' হাতে। নইলে আর আমার এখানে জায়গা পায়?'

জলভরা ঘটি নামিয়ে রাখল মামুদ খাঁ। বললে, 'পুলিশ ডাকে না কেউ? থানায় খবর দেয় না?'

'দারোগা জমাদার সবাইকে দেয়া হয়েছে একখানা করে।' নিত্যগোপী মামুদ খাঁর ফালা-খাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া জোব্বা-জামার দিকে তাকাল। বললে, 'তুমি একখানা নেবে খান সাহেব? এই শীতে জামা-কাপড় তো তোমার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই যা হাওয়া ছুটবে নদীর উপর দিয়ে—'

'না। চোরাই মাল আমি ছুঁই না।'

মামুদ খাঁ নেমে পড়ল উঠোনে।

'এ কি, জল খেয়ে যাও।'

'না। পানি ভি খাব না।'

মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটতে লাগল। যেন সে রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে। টক-টক, নোনতা-নোনতা লোভের রক্তের স্বাদ। মহেন্দ্রদেরও কপাল যখন এক দিন ফাটবে তখন অনায়াসেই মনে করতে পারবে সে সেই রক্তের তার। জল দিয়ে তা সে আজ ফিকে করবে না।

লোকে দেখুক, দেখে রাখুক। রক্তমাখা মুখেই মামুদ খাঁ খেয়ার নৌকোয় গিয়ে উঠল।